যে খাবার খেয়ে সুস্থ থাকব

যিশু জিজ্ঞেস করল—আমাদের সবার কি একইরকমের খাবারের দরকার হয় ?

দিদি বললেন — না। আমরা সবাই তো একই ধরনের কাজ করি না। কোনোটায় অনেক বেশি পরিশ্রম, কোনোটায় একটু কম। কাজ অনুযায়ী শক্তির চাহিদাও বদলায়। শক্তির চাহিদা বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে আবার খাবার খাওয়ার ধরন আর পরিমাণও বদলায়।

সহেলি জিজ্ঞেস করল —তাহলে আমরা কীভাবে বুঝব কোন কোন খাবার খেতে হবে?

—আসলে আমাদের নানারকম খাবার মিলিয়ে মিশিয়ে খেতে হয়। বিভিন্ন ধরনের খাবার সঠিকভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে

খাওয়ার জন্য একটা পরিকল্পনা করা হয়। যাতে শরীরের শক্তির চাহিদা মেটে, সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারি আর রোগ প্রতিরোধও করতে পারি। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিদিন সবধরনের খাবার পরিমাণ মতো মিলিয়ে মিশিয়ে খাওয়া- এটাই সুষম আহার।

যিশু জিজ্ঞেস করল - সব মানুষের সুষম আহার কি একই রকমের?

— প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে সুষম আহার একই রকমের হয় না। কাজের ধরন অনুযায়ী সুষম আহার পালটে যায়। শুধু তাই নয় সুষম আহার কেমন হবে, তা নির্ভর করে বয়স, শরীরের ওজন, উচ্চতা, কোনো জায়গার জলহাওয়ার মতো বিষয়ের ওপরেও।

সহেলি জিজ্ঞেস করল— সুষম খাবারের মধ্যে কী কী ধরনের খাবার থাকে দিদি?

— সুষম খাবারের মধ্যে মূলত চার ধরনের খাবার থাকে। এই চার ধরনের খাবারের নাম নীচের তালিকায় দেওয়া আছে। তোমার অঞ্চলের পরিচিত খাবারগুলোকে নীচের নির্দিষ্ট ঘরে লেখো।

দানাশস্য জাতীয় খাবার	শাকসবজি ও ফলজাতীয় খাবার	তেল, ঘি, বাদামজাতীয় খাবার	মাছ, মাংস, ডিমজাতীয় খাবার
১. ভাত	১. কুমড়ো শাক	১. ঘি	১. মাছ
২. রুটি	২. পেয়ারা	২. বাদাম	২.
৩.	৩.	৩.	৩.
৪.	৪.	৪.	৪.
৫.	৫.	৫.	৫.
৬.	৬.	৬.	৬.
৭.	৭	৭.	৭.
৮.	৮.	৮.	৮.

আচ্ছা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার মানুষেরা কী ধরনের খাবার খেত? বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচে লেখো।

দানাশস্য জাতীয় খাবার	শাকসবজি ও ফলজাতীয় খাবার	তেল, ঘি, বাদামজাতীয় খাবার	মাছ, মাংস, ডিমজাতীয় খাবার

খাবার পাই কোথা থেকে ?

আমরা কোন কোন খাবার উদ্ভিদ থেকে পাই, আর কোন খাবারই বা প্রাণীদের থেকে পাই তা নীচে লিখে ফেলো।

খাবারের নাম	উদ্ভিদ থেকে পাই	প্রাণী থেকে পাই	তোমার বাড়িতে কে কোনটা খায়

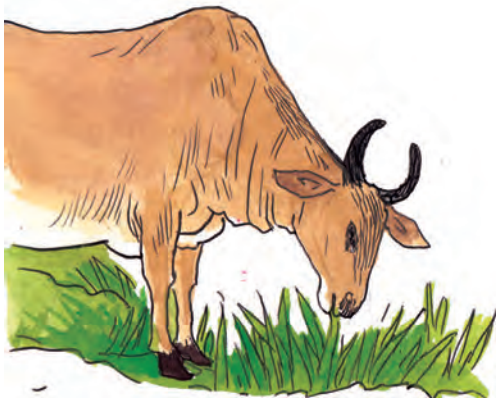

এবারে এসো আমরা জানার চেষ্টা করি কোন কোন খাবার থেকে বিভিন্ন প্রাণী ও মানুষ শক্তি পায় ।

জীবের নাম	কোন কোন খাবার থেকে শক্তি পায়
১. গোরু	১.
২. হাতি	২.
৩. বাঘ	৩.
৪. মাছ	৪.
৫. হরিণ	৫.
৬. কচ্ছপ	৬.
৭. সাপ	৭.
৮. ব্যাং	৮.
৯. মাছরাঙা	৯.
১০. মানুষ	১০.

দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন— মানুষ আর বিভিন্ন প্রাণী কোন ধরনের খাবার থেকে শক্তি পায় ?

আসলাম বলল— উদ্ভিদ থেকে।

অরুণ বলল— কেন, প্রাণীদের থেকেও তো পাই। দুধ, ডিম।

— তোমরা দুজনেই ঠিক বলেছ। আচ্ছা দুধ বা ডিম আমরা কোন প্রাণী থেকে পাই ?

অরুণ বলল, দুধ পাই গোরু ও ছাগল থেকে। আর ডিম দেয় মুরগি।

— বেশ। বলতে পারবে কি গোরু, ছাগল আর মুরগি কী খায় ?

শামিম বলল— গোরু তো ঘাস খায় ।

অরুণ বলল — ছাগলও তো ঘাস খায়, গাছের পাতাও খায়।

মঞ্জু বলল— মুরগি তো চাল, গম এইসব খায় ।

অরুণরা আলোচনা করুক। আর সেই ফাঁকে তোমরা কয়েকটা প্রাণীর নাম লিখে ফেলো যাদের থেকে আমরা বিভিন্ন খাবার পাই। আর ওই প্রাণীরা কী কী খায় সেটাও লেখার চেষ্টা করোতো।

প্রাণীর নাম	আমরা কী খাবার পাই	ওই প্রাণী নিজে কী খায়	কোথা থেকে পায় (উদ্ভিদ/প্রাণী)
১. গোরু	১.	১.	১.
২. ছাগল	২.	২.	২.
৩. মুরগি	৩.	৩.	৩.
৪. হাঁস	৪.	৪.	৪.
৫.	৫.	৫.	৫.

গাছের খাবার তৈরি

দিদিমণি বললেন — প্রাণী থেকে আমরা বেশ কিছু খাবার পাই। আচ্ছা তাহলে ওই প্রাণীরা খাবার পায় কোথা থেকে বলো দেখি?

আসমা বলল— গাছ থেকে দিদি।

—ওই প্রাণীদের কাছ থেকে আমরা যে খাবার পাই, তার মূলে আছে গাছেরা। তাহলে সব খাবারের মূলে কারা?

শামিম বলল— সব খাবারই আমরা পাই আসলে গাছদের থেকে।

— ঠিক বলেছ। সরাসরি বা ঘুরপথে উদ্ভিদেরাই হলো আমাদের সব খাবারের উৎস। উদ্ভিদেরা খাবার পায় কোথা থেকে বলো দেখি?

মঞ্জু বলল— দিদি, মাটি থেকে পায় কি ?

— মাটি থেকে তৈরি খাবার পায় না। কিন্তু মাটি থেকে জল আর খাবার তৈরির কিছু দরকারি উপাদান পায়। বাতাসের একটা উপাদান কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সে বাতাস থেকে টেনে নেয়। খাবার তৈরি করতে আর লাগে সূর্যের আলো।

শামিম জিজ্ঞেস করল—গাছ কোথায় খাবার তৈরি করে দিদি?

— গাছ তার শরীরের সবুজ অংশগুলোতে খাবার তৈরি করে। খাবার তৈরি করার সময় তৈরি হওয়া অক্সিজেন গ্যাস সে বাতাসে মিশিয়ে দেয়। তৈরি হওয়া খাবারের কিছুটা গাছ নিজে ব্যবহার করে। আর বাকিটা গাছ জমিয়ে রাখে নিজের শরীরে। আসলে সূর্য থেকে পাওয়া শক্তির

একটা অংশই উদ্ভিদের তৈরি খাবারে জমা থাকে। এবারে ছবির ফাঁকা বাক্স দুটো ভরতি করে ফেলো।

শামিম বলল—তার মানে সূর্যের শক্তি জমা থাকে উদ্ভিদের তৈরি করা খাবারে। আর খাবার খেলে সেই শক্তিই আসে প্রাণীদের দেহে।

— ঠিক তাই। তারপর দরকার মতো সেই শক্তিই প্রাণীরা ব্যবহার করে। মাছরাঙা আর চিল ছোঁ মেরে মাছ শিকার করে, বাঘ হরিণ শিকার করে, মৌমাছি ফুলের মধু খুঁজে বেড়ায়, মাছ সাঁতার কাটে। আর মানুষ দিনরাত কতরকম কাজেই না এই শক্তি খরচ করে।

মানুষ আর অন্যান্য প্রাণীরা কীভাবে উদ্ভিদদের ওপর নির্ভর করে, তার একটা ছবি তোমাদের খাতায় আঁকো।

খাবার থেকে শক্তি পাই কীভাবে

টিফিন শেষের ঘণ্টা পড়ে গেছে। দিদিমণি নিশ্চয়ই ক্লাসে এসে গেছেন। শামিম, মঞ্জু আর মেরি তাড়াতাড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছিল। ক্লাসে ঢুকে বেঞ্চিতে বসে তারা হাঁপাতে লাগল।

দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা এমন হাঁপাচ্ছ কেন?

মেরি বলল- তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম তো, তাই।

— তোমরা কেউ কি খেয়াল করে দেখেছ, হাঁপানোর সময় তোমরা জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলে?

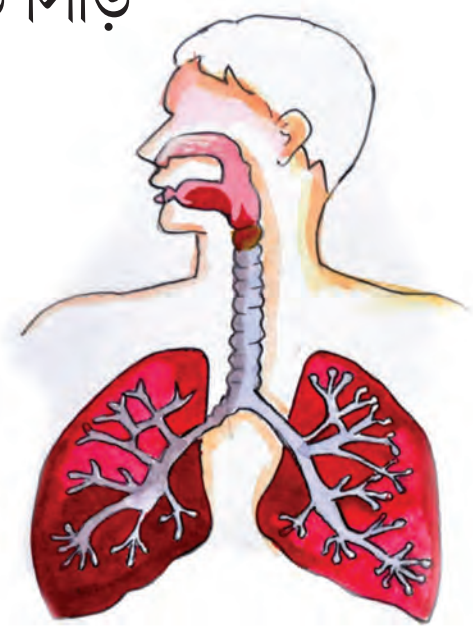

মঞ্জু বলে উঠল—হ্যাঁ দিদি ঠিকই তো!

— দৌড়োনোর সময় বা সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় তোমরা কী খরচ করো বলোতো?

শামিম বলল— শক্তি। তাই না দিদি?

— ঠিক। কিন্তু শক্তি পাও কোথা থেকে বলোতো?

অরুণ বলল— খাবার থেকে দিদি।

— ঠিক। কিন্তু খাবার থেকে আমরা শক্তি পাই কীভাবে জানো কি?

মেরি বলল— খাবার থেকে নিশ্চয়ই কোনোভাবে আমরা শক্তিটাকে বের করে নিই।

— ঠিকই বলেছ। কিন্তু কীভাবে? এসো এবারেই আমরা সেটাই বোঝার চেষ্টা করি। আমরা বাতাস থেকে শ্বাস নিই। বাতাস থেকে আমাদের শ্বাস নেওয়াটা হলো প্রশ্বাস। আচ্ছা, বিষম খাওয়ার কথা আলোচনা করার সময় একটা বাতাস যাওয়ার নলের কথা বলেছিলাম। মনে আছে?

আফসানা বলল— হ্যাঁ দিদি। আমাদের গলার ভেতরে দুটো নল আছে পাশাপাশি।

অরুণ বলে উঠল— মনে পড়েছে দিদি। একটা দিয়ে খাবার যায়। আর অন্যটা দিয়ে যায় বাতাস।

— বাহ! তোমার তো খুব ভালো মনে আছে দেখছি। ওই বাতাস যাওয়ার নলটা হলো শ্বাসনালি। শ্বাসনালির শেষে দুটো থলির মতো অংশ আছে। এরা হলো ফুসফুস। প্রশ্বাস নেওয়ার সময় বাতাস নাক দিয়ে ঢুকে শ্বাসনালি হয়ে ফুসফুসে গিয়ে পৌঁছোয়।

অরুণ জিজ্ঞেস করল— অনেকসময় তো আমরা মুখ দিয়েও প্রশ্বাস নিই। তাই না দিদি?

— ঠিকই। তবে মুখ দিয়ে প্রশ্বাস নিলেও বাতাস কিন্তু শ্বাসনালি দিয়েই ফুসফুসে পৌঁছোয়। তবে নাক দিয়ে ঠিকমতো শ্বাস নিতে না পারলে তবেই মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হয়।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করল— বাতাস ফুসফুসে পৌঁছোনোর পর কী হয় দিদি?

— বাতাসের একটা উপাদান হলো অক্সিজেন গ্যাস। বাতাস ফুসফুসে পৌঁছোয়। ফুসফুস এবার ওই বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্যাসটাকে টেনে নেয়। আর তারপরে এই অক্সিজেন গ্যাসটাই শরীরের ভেতরে গিয়ে খাবার থেকে শক্তি বের করতে সাহায্য করে। দৌড়োনো বা সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় তোমাদের শক্তির প্রয়োজন হয়। আর এই শক্তি তোমরা পাও খাবার থেকে। তাইতো?

আফসানা বলল— আর অক্সিজেন গ্যাস ওই খাবার থেকে শক্তি বের করতে সাহায্য করে। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় জোরে জোরে শ্বাস নিতে হয় কেন দিদি?

—দৌড়োনো বা সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি ওঠার সময় বেশি শক্তির দরকার হয়।

পাশ থেকে অরুণ বলে উঠল — আর তার জন্য লাগে বেশি অক্সিজেন। আর বেশি অক্সিজেন শরীরে ঢোকানোর

জন্য জোরে জোরে শ্বাস নিতে হয়। তাই আমরা হাঁপিয়ে যাই। তাই না দিদি?

— ঠিক বলেছ। আমরা যেমন শ্বাস নিই, তেমনই আমরা শ্বাসও তো ছাড়ি। শ্বাস ছাড়াকে বলে নিশ্বাস।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, নিশ্বাস ছাড়ার সময়ও তো কিছুটা বাতাস আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে যায় !

— হ্যাঁ। ঠিক তাই। এই বাতাসের সঙ্গেই আমাদের শরীরে তৈরি হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

শামিম জিজ্ঞেস করল — নিশ্বাস ছাড়ার সময় বাতাস কীভাবে আমাদের শরীরের বাইরে বেরোয়?

— প্রশ্বাসের সঙ্গে যে পথ দিয়ে বাতাস শরীরে ঢুকেছিল, আবার নিশ্বাসের সঙ্গে সেই পথেই বাতাস বাইরে বেরিয়ে যায়। প্রশ্বাস আর নিশ্বাসকে একসঙ্গে বলে শ্বাসক্রিয়া। শ্বাসক্রিয়ার সময় পরিমাণ মতো অক্সিজেন শরীরে ঢুকলে তবেই স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

খাবার থেকে শক্তি পাই কীভাবে?

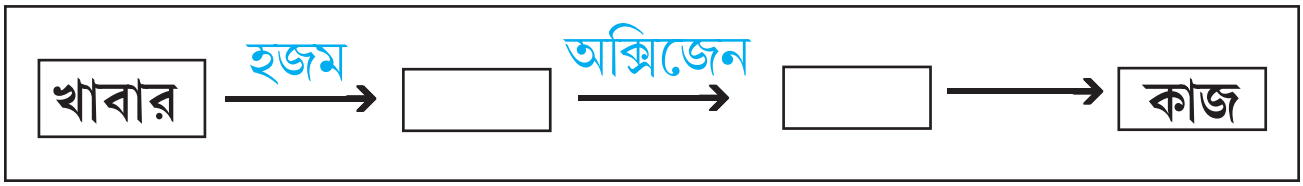

প্রশ্বাসের পথ

নিশ্বাসের পথ

অরুণ জিজ্ঞেস করলে— গাছ খাবার তৈরি করার সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নেয়। আর অক্সিজেন গ্যাস ছাড়ে। তাহলে শ্বাসক্রিয়ার সময় গাছ কী করে?

দিদিমণি বললেন— ভালো প্রশ্ন করেছ। গাছও অন্যান্য প্রাণীদের মতো শ্বাসক্রিয়ার সময় অক্সিজেন নেয় আর কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়।

নীচের ঘটনাগুলো তুমি দেখো আর ভাবো:

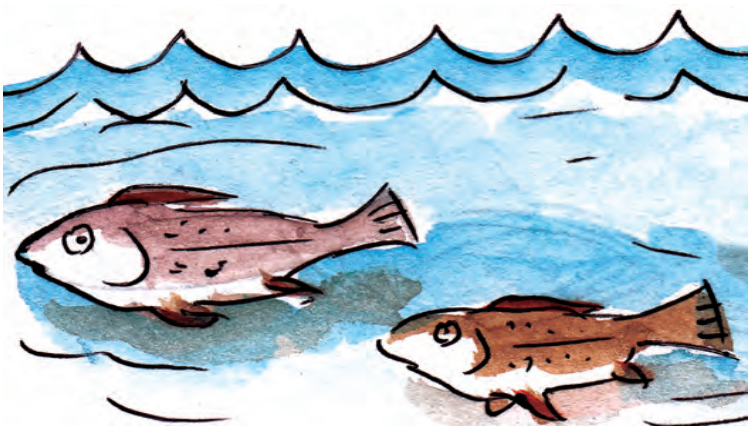

রুই, কাতলা মাছ জল থেকে তুললেই মারা যায়। কিন্তু শোল, ল্যাটা, কই, শিঙি, মাগুর মাছ জল থেকে তোলার পরও অনেকক্ষণ বেঁচে থাকে!

কেঁচোর থাকার গর্তগুলো যখন বর্ষাকালে জলে ভরে যায় তখন কেঁচো কেন ওপরে উঠে আসে?

আমরা তো শিখলাম প্রশ্বাস আর নিশ্বাসের সময় আমরা নাকের ফুটোকে ব্যবহার করি। কিন্তু ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নেভানোর সময়,শাঁখ বা ভেঁপু বাজানোর সময় আমরা কী করি?

ঘরে মশার ধুপ জ্বালালে, কাঠের গুড়ো নাকে ঢুকলে, পরাগরেণু বা ছত্রাকজাতীয় জীব শ্বাসনালীতে ঢুকলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

তোমার বাড়ির কেউ যদি কয়লাখনি, কাচের কারখানা, তুলোর কাজ বা অ্যাসবেস্টসের কাজে যুক্ত থাকেন কিংবা নিয়মিত সিগারেট খান, তবে ফুসফুস বা শ্বাসনালির রোগে আক্রান্ত হতে পারেন।

শ্বাসবায়ু ও স্বাস্থ্য

দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন— এবারে বলোতো প্রতিদিনের কাজ করার শক্তি পেতে, স্বাস্থ্য ভালো রাখতে কী দরকার?

অরুণ বলল--- জানি দিদি। দেখতে হবে যাতে পরিমাণমতো অক্সিজেন শরীরে ঢোকে। তবেই তো আমরা কাজ করার শক্তি পাব।

শামিম বলল— আমার দাদু প্রায়ই রাতে জেগে থাকেন। শুলেই কাশি হয়। আর বুকে খুব কষ্ট, দম নিতেও কষ্ট হয়।

— দাদুকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে তো?

শামিম বলল— হ্যাঁ দিদি। ডাক্তারবাবু বলেছেন দাদুর নাকি ফুসফুসের কাজ করার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। তাই দাদু আর আগের মতো শ্বাসক্রিয়া চালাতে পারছেন না।

— আসলে অক্সিজেন যতটা দরকার, ততটা তোমার দাদু নিতে পারছেন না। আবার কার্বন ডাইঅক্সাইডও পুরোটা বের করতে পারছেন না শরীর থেকে।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করল—শামিমের দাদুর দমের কষ্ট হচ্ছে কেন দিদি?

— বেশি করে অক্সিজেন পাওয়ার জন্য উনি বেশি করে প্রশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আবার একইসঙ্গে নিশ্বাস ছাড়তেও কষ্ট হচ্ছে।

আফসানা বলল— খুব জোরে দৌড়ে এলে আমাদের যেমন কষ্ট হয়, অনেকটা তেমনি, তাই না দিদি?

— ঠিক তাই।

শামিম বলল—জানেন দিদি ডাক্তারবাবু আবার দাদুর বুকের ছবিও তুলেছেন। এই ছবি কেন তোলে দিদি?

— একটা বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে বুকের ছবি তোলা হয়। আমাদের বুকের ভেতরের বিভিন্ন অংশ এই ছবিতে দেখা যায়। ফুসফুস কেমন আছে, সেটাও এই ছবি থেকে বুঝতে পারা যায়। সেইরকম একটা ছবি ওপরে দেখানো হলো।

অরুণ জিজ্ঞেস করল—শামিমের দাদুর মতো এমন কেন হয় দিদি?

— যে-কোনো ধরনের ধোঁয়া বা ধুলো শরীরের ভেতরে ঢুকে ফুসফুসের ক্ষতি করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষতির পরিমাণও অনেক বেড়ে যেতে পারে। ফলে সাধারণ হাঁটাচলা করতে গেলেও মানুষ হাঁপিয়ে যেতে পারে।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করল—কী করলে ফুসফুস ভালো থাকবে দিদি ?

— খুব ভালো প্রশ্ন করেছ। নিয়মিত শ্বাসের ব্যায়াম করা দরকার। মুক্ত বাতাসে ছোটাছুটি বা খেলাধুলা করলেও ফুসফুস ভালো থাকে। এছাড়াও ফুসফুস ভালো রাখতে যে-কোনো ধরনের ধোঁয়া-ধুলো (যেমন- কলকারখানা বা গাড়ির ধোঁয়া) থেকেও দূরে থাকা দরকার।

জীবনের জন্য বাতাস

খবরের কাগজে পাহাড়ে ওঠার একটা ছবি আজ দিদিমণি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

দিদিমণি ছবিটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন— এঁরা কেমন পোশাক পরেছেন?

পরান বলল— এঁদের প্রত্যেকের গায়েই মোটা পোশাক, পায়ে ভারী জুতো আর পিঠে কী একটা নলের মতো।

দিদিমণি বললেন— উঁচু পাহাড়-চূড়ায় বাতাস কমে যায়, তাই অক্সিজেন কম থাকে। শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয়।

পরান বলল— ওরা তাহলে উঁচু পাহাড়ে ওঠার জন্য সিলিন্ডারে ভরে অক্সিজেন গ্যাস সঙ্গে নিয়ে যায়।

—একটা রুই বা কাতলা মাছকে জল থেকে মাটিতে তুললে কী হয় বলোতো?

মিতুন বলল— ছটফট করতে করতে একসময় নিস্তেজ হয়ে যায়।

— গাছপালা ও প্রাণী সকলেরই জীবনের সঙ্গে অক্সিজেন জড়িয়ে আছে। আমরা শ্বাস নেবার সময় যে বাতাস নিই, তার অক্সিজেনটা আমাদের কাজে লাগে। তাই বাতাসে যদি দরকার মতো অক্সিজেন না থাকে তবে শ্বাসকষ্ট হয়। এসো আমরা বুঝে নিই বাতাসে অক্সিজেন থাকার প্রয়োজন কতটা।

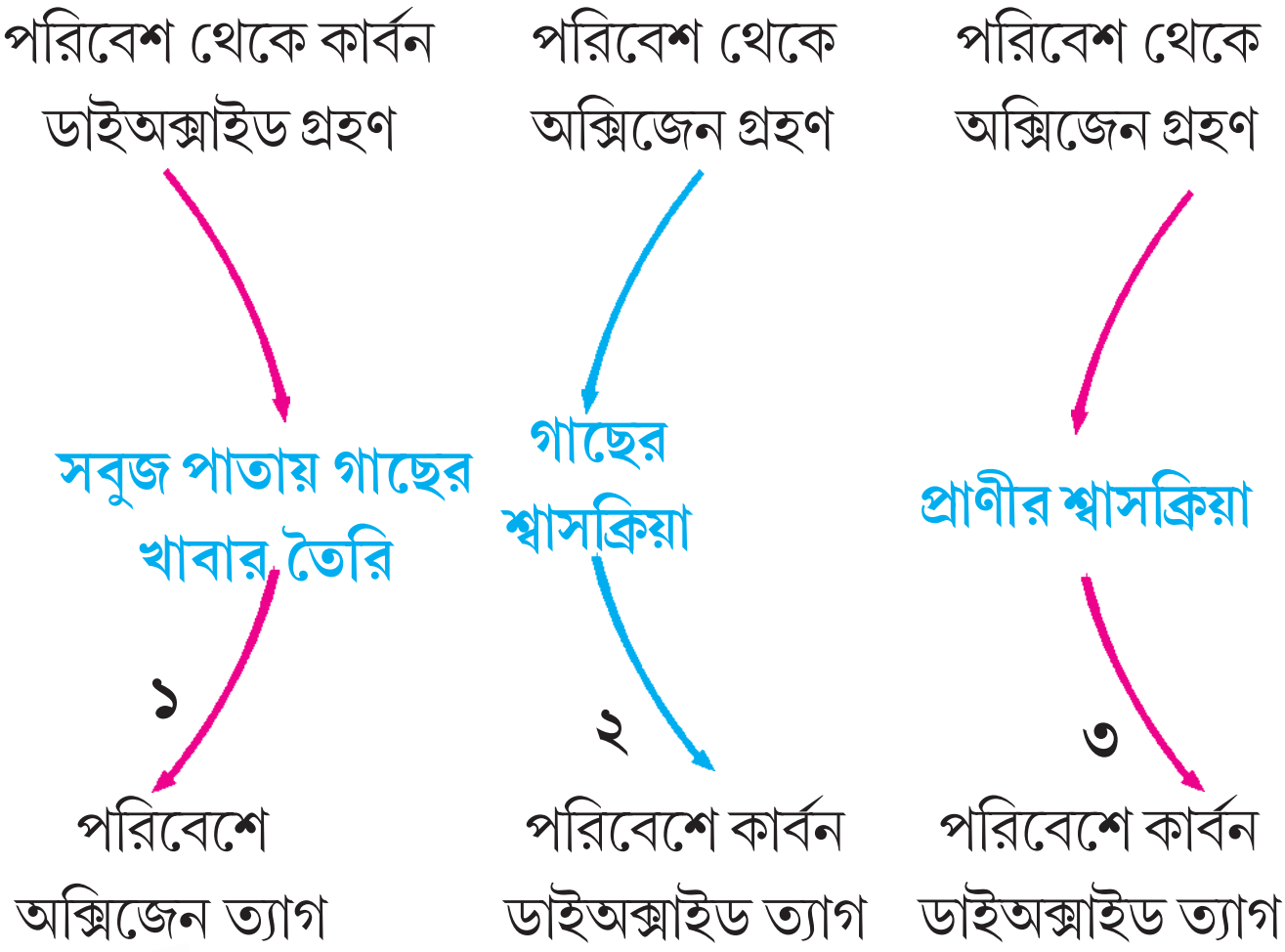

আগের পাতার ছকগুলো দেখো। নীচের ফাঁকা স্থান পূরণ করো।

ক. ১ নং ছক গাছ কীভাবে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডকে কাজে লাগায়?

.....।

খ. ২নং ও ৩নং ছক কোথায় মিল বা অমিল দেখতে পাচ্ছ তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো।

.....।

দিদিমণি বললেন— তাহলে দেখো বাতাসে অক্সিজেনও আছে, কার্বন ডাইঅক্সাইডও আছে।

বাতাসের মধ্যে এত কিছু!

দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন — একটা ভিজে কাপড় রোদের মধ্যে মেলে দিলে কী হয়? মিতালি বলল — কাপড়টা শুকিয়ে যায়।

--- তখন ভিজে কাপড়ের অত জল কোথায় যায় বলোতো ? ভিজে কাপড় শুকিয়ে গিয়ে তার জলটা বাতাসেই মিশে যায়। সাধারণতঃ শীতকালে ভিজে জামাকাপড় তাড়াতাড়ি শুকোয় কিন্তু বর্ষাকালে দেরি হয়।

এরপর দিদিমণি একটা শুকনো গ্লাসের মধ্যে কয়েক টুকরো বরফ ফেলে দিলেন। গ্লাসটা কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে সবাই যা দেখছে তা বলতে বললেন।

নিনা বলল— প্রথমে গ্লাসের গায়ে গুঁড়িগুঁড়ি জল জমা হলো। তারপর গ্লাসের গা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

— এই জলটা কোথা থেকে এল? বাতাসের মধ্যেই জলীয় বাষ্প মিশে আছে, যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। ঠান্ডা গ্লাসের স্পর্শে এসে তারা জলের ফোঁটা তৈরি করল।

রেহানা বলল— পুকুর, নদী, সাগরের জল শুকিয়ে এই জলীয় বাষ্প বাতাসে আসে তাই না দিদি?

— ঠিক বলেছ। আবার জলীয় বাষ্প ঠান্ডা হয়। তখন বাতাসে ভেসে থাকা সূক্ষ্ম ধুলোর কণার ওপর জলের ফোঁটাগুলো জমে। এভাবেই মেঘ তৈরি হয়।

মিতালি বলল— কিন্তু এত ধুলোর কণা কীভাবে আসে বাতাসে?

— নানাভাবেই আসতে পারে। পাথর ভাঙার সময় তার গুঁড়ো বাতাসে মেশে। গাড়ি চললে, জোরে বাতাস বইলে, ধুলোঝড় শুরু হলে, কয়লা ভাঙলে — এরকম কণা

বাতাসে মিশতে থাকে। বাতাসে জলীয় বাষ্প কমে গেলেও মাটির কণাও ধুলো হয়ে বাতাসে মিশে যায়।

— আরো কী কী বাতাসে মিশে থাকে?

— লেপ-তোশক বানানোর সময়, চটকলে পাটের দড়ি-বস্তা তৈরির সময় তার রোঁয়া মিশে যায় বাতাসে। বিভিন্ন ফুলের রেণুও এভাবে উড়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে। দিনের বেলা একটা বন্ধ ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আলো ঢুকলে এই গুঁড়োগুলোকে বাতাসে ভাসতে দেখো।

— রাতে টর্চের আলো জ্বাললেও এদের দেখা যায়। দেখা যায় না এরকম আরো কিছু কি বাতাসে আছে দিদি?

— হ্যাঁ, বাতাসে থাকে নানান বর্ণহীন গ্যাস যাদের আমরা দেখতে পাই না।

নীচের ছবিতে বাতাসে তাদের কোনটা বেশি কোনটা কম হলো। যে গ্যাসটা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আছে তার নাম কী?

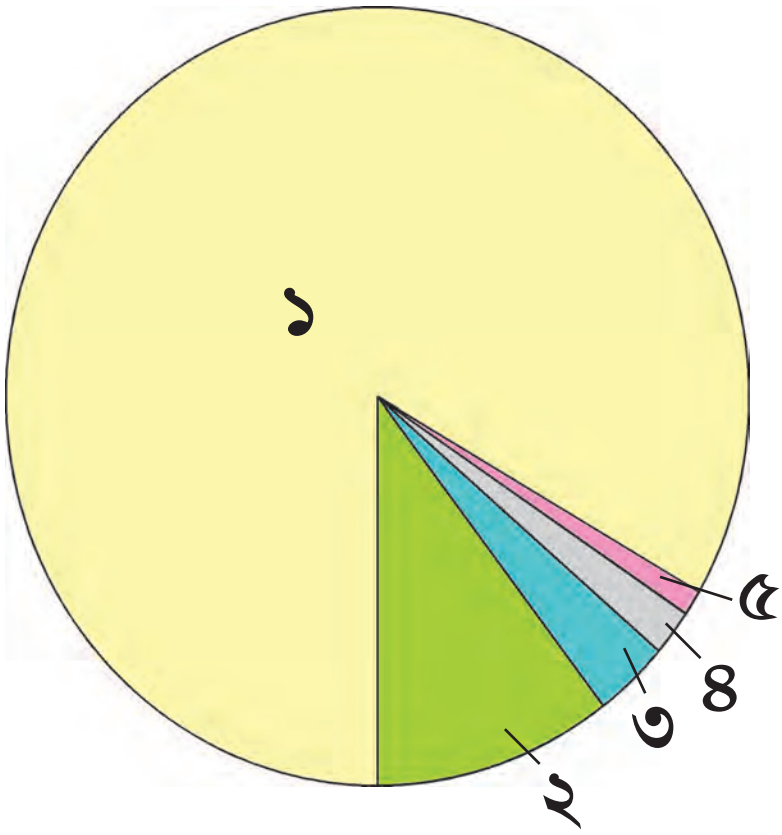

১ নাইট্রোজেন

২ অক্সিজেন

৩ জলীয় বাষ্প

৪ নিষ্ক্রিয় গ্যাস

৫ কার্বন ডাইঅক্সাইড

— উপরের ছবিটা দেখো। বাতাসের মধ্যে থাকা উপাদান কোনটা কতটা আছে তা বিভিন্ন রং-এ দেখানো হয়েছে। তোমাদের বোঝার জন্য ছবিতে রং দেওয়া হলো।

— নাইট্রোজেন গ্যাস।

— এটাও আমাদের শরীরের জন্য খুবই দরকারি। বাতাসে সবচেয়ে বেশি থাকলেও উদ্ভিদ বা প্রাণীরা সরাসরি এটা নিতে পারে না। এছাড়াও বাতাসে আরো অন্যান্য কিছু গ্যাস থাকে।

— আচ্ছা দিদি, সব জায়গার বাতাসে এই উপাদানগুলো একই পরিমাণে থাকে?

— না, সবজায়গার বাতাসে এই উপাদানগুলো একই পরিমাণে থাকে না। ওপরের ছবিটি দেখে বলতো কলকারখানা অঞ্চলের বাতাসে কী কী মিশতে পারে?

পরাণ বলল— কলকারখানা থেকে বেরোনো ধোঁয়া, ধুলো এসব মিশে যায় বাতাসে।

— এগুলো আসলে বাতাসের অবাঞ্ছিত উপাদান। তখন তাহলে বাতাসের উপাদানগুলোর পরিমাণের কিছু পরিবর্তন ঘটে যায়।

নীচের তালিকায় বাতাসে উপস্থিত কিছু পদার্থের নাম দেওয়া হলো। কোন ক্ষেত্রে এগুলির কম বা বেশি হতে পারে তা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে লেখো।

বাতাসে থাকা কয়েকটি পদার্থের নাম	কলকারখানা অঞ্চলে
১. অক্সিজেন	
২. কার্বন ডাইঅক্সাইড	
৩. ধুলোর কণা	

--- তাহলে তো দিদি, সব জায়গার বাতাসে এই উপাদানগুলো একই পরিমাণে থাকে না!

— তুমি ঠিকই বুঝতে পেরেছ। স্থান বা সময় পালটে গেলে ওই উপাদানগুলোর পরিমাণ পালটে যায়।

তোমরা বন্ধুরা মিলে একটু খুঁজে দেখো কোন কোন জায়গা থেকে তোমাদের এলাকার বাতাসে অবাঞ্ছিত জিনিস মিশছে। সেই উৎসগুলোর নাম লেখো।

কোন জায়গায়	বাতাসে কী কী মিশছে
১. গাড়ি চলাচলের রাস্তায়	ধুলো, ধোঁয়া
২.	.....
৩.	.....
৪.	.....

শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে তোমাদের স্কুলে একটা পোস্টার আঁকার প্রতিযোগিতার আয়োজন করো :

বিষয়— নির্মল বায়ু ও প্রাণ (নিজেরাও বিষয় পছন্দ করো)।

সময় বা কাল পালটে গেলে বাতাসের আরও কী কী পদার্থ বদলে যায় তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

কখনও গরম, কখনও বৃষ্টি, কখনও বা ঠান্ডা

দিদিমণি বললেন--- বাতাসে কী কী উপাদান আছে আগের দিন তা আমরা জেনেছি। বিভিন্ন জায়গায় সেগুলো কমে বাড়ে তাও আমরা জেনেছি। একই জায়গায় বছরের বিভিন্ন সময়ে এই উপাদানগুলোর কমা-বাড়া কি তোমরা বুঝতে পারো?

ভিজে জামাকাপড় বর্ষাকালে সহজে শুকোতে চায় না। কিন্তু শীতকালে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। তার কারণ হলো শীতকালের বাতাসে জলীয় বাষ্প কম।

বছরের কোন কোন সময়ে উষ্ণতা বাড়ে বা কমে। এবার নীচের ছবিগুলি দেখো। বছরের বিভিন্ন সময়ের বৈশিষ্ট্যগুলো ছবির পাশে লেখো

হাঁসফাসানো গ্রীষ্মে সবার
প্রাণ করে আইঢাই

ঋতুর নাম	বৈশিষ্ট্য

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে।

ঋতুর নাম	বৈশিষ্ট্য

আকাশ জুড়ে ছড়ানো মেঘ পেঁজা তুলোর ভেলা।

ঋতুর নাম	বৈশিষ্ট্য

মাঠে মাঠে সোনালি ধান চাষির মুখে আনন্দের গান

ঋতুর নাম	বৈশিষ্ট্য

শীত লেগেছে ডালে ডালে কেবল পাতা ঝরা
শীত লেগেছে ছেলে বুড়োর গরম জামাপরা।

ঋতুর নাম	বৈশিষ্ট্য

বসন্ত আজি রাঙায় ডালি, রং-বেরঙের ফুলে
আমের ডালে গাইছে কোকিল হাওয়ায় দুলে দুলে।

ঋতুর নাম	বৈশিষ্ট্য

দিদিমণি বললেন — ছবি দেখে তোমাদের কী মনে হলো?

শ্যাম বলল — বছরের বিভিন্ন সময় রোদের তেজ একরকম নয়। শুধু রোদ কেন, বাতাস, মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশাও বছরের সব সময় একরকম হয় না বা থাকে না। দিন বা রাতও ছোটো বড়ো হয়।

দিদিমণি বললেন — কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন জায়গার এই বিষয়গুলি কেমন থাকে সেটাই হলো ওই জায়গার আবহাওয়া।

তাহলে এবার নীচের জায়গাগুলোতে আবহাওয়া কেমন হতে পারে বলে তোমাদের মনে হয়

অঞ্চলের নাম	আবহাওয়া কেমন
পাহাড়ি অঞ্চলে	
সমুদ্রের ধারে	
লালমাটির অঞ্চলে	
জঙ্গলের ধারে	

বছরে নীচের মাসগুলোতে আবহাওয়ার বিভিন্ন বিষয়গুলো কেমন ছিল তা তোমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পূরণ করো। দরকারে বন্ধু বা শিক্ষক -শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

মাস	আবহাওয়ার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য			
	গরম কতটা ছিল	রোদ ঝলমলে ছিল/ মেঘলা ছিল	বৃষ্টি কতটা হয়েছে (বেশি/মাঝারি/ কম)	বাতাস কত জোরে বইছিল
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল- মে - জুন)				
আষাঢ়- শ্রাবণ (জুন-জুলাই-আগস্ট)				
ভাদ্র-আশ্বিন (আগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর)				
কার্তিক-অগ্রহায়ণ (অক্টোবর-নভেম্বর - ডিসেম্বর)				
পৌষ-মাঘ (ডিসেম্বর-জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি)				
ফাল্গুন-চৈত্র (ফেব্রুয়ারি-মার্চ-এপ্রিল)				

ওপরের তালিকাটা ভালো করে দেখো। এর থেকে এমন বিষয় লেখো যেগুলো বদলালে আবহাওয়া বদলায়।

কী কী বিষয়ের ওপর আবহাওয়া নির্ভর করে	ওগুলো বদলালে আবহাওয়ার কী কী পরিবর্তন হয়
১. বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ ২. ৩.	

এবার তোমরা নীচের ছবিগুলোতে নানা রং ও আকারের মেঘ দেখো। তারপর শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে নীচে লেখো।

গরমকালের মেঘ

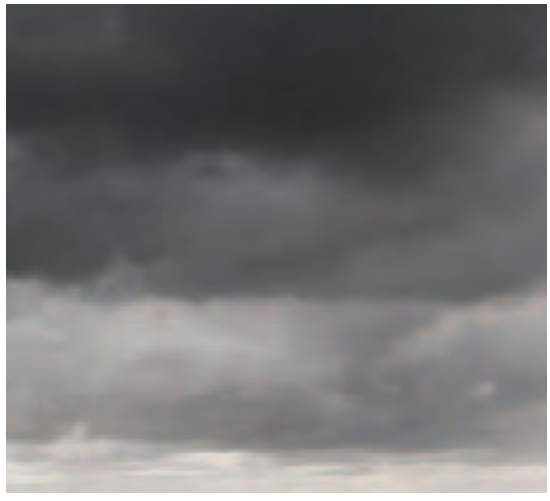

বর্ষাকালের মেঘ

শরৎ ও শীতকালের মেঘ

মেঘের রং কেমন	বছরের কোন সময়ের মেঘ	ওই সময়ের আবহাওয়া কেমন	কোন মেঘে ঝড়বৃষ্টি হয়

কত রকম ফুল, কত রকম উৎসব

দিদিমণি বললেন— এই আবহাওয়ার জন্যই চারিদিকে কতই না ঘটনা ঘটছে। তোমরা কি তার কয়েকটা বলতে পারো?

আমিনুল বলল — আমাদের ভগবানগোলায় মাইলের পর মাইল জুড়ে আমবাগান। কিন্তু দুঃখের কথা এবার আমগাছে মুকুলই আসেনি। গত বছর তো শিলাবৃষ্টি হয়ে ছোটো আমগুলো নষ্ট হয়ে গেছিল। একবার মাঠেই সরষে নষ্ট হলো। সজনে গাছে ফুল ফুটতে দেরি হয়। ধান গাছে পোকা লাগে।

বুধনের বীজতলার ধানের চারা এবছর মাঠে রোয়ার আগেই হলুদ হয়ে গেছে। অনেকদিন ধরে বৃষ্টির কোনো দেখা নেই। এত গরম পড়েছে যে পুকুরের জলও শুকিয়ে গেছে।

মিনতিদের কাঁচা বাড়ি সেদিনের ঝড়ে মাটিতে পড়ে গেছে। আরো কত দোকানপাটের চাল উড়ে গেছে।

দিদিমণি বললেন— রেডিয়ো বা টিভিতে বা খবরের কাগজে প্রতিদিন আবহাওয়ার আগাম খবর থাকে। এবার থেকে তোমরা রোজ তা শুনবে ও পড়বে। তারপর প্রতিদিন ক্লাসে এসে একজন করে আবহাওয়ার ওই খবর বলবে। এতে আগে থেকে অনেক ক্ষয়ক্ষতি কমানো যাবে।

শমীকরা আমিনার কাছে শুনেছে সমুদ্রের ধারের আবহাওয়া নাকি সারা বছর একইরকম থাকে।

দিদিমণি বললেন— সারা বছর এক না থাকলেও বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে প্রত্যেক জায়গার আবহাওয়া একরকম থাকে। দেখোতো আমার কথার সঙ্গে তোমাদের অভিজ্ঞতা মেলে কিনা?

মাসের নাম	আবহাওয়া
১। ডিসেম্বর - জানুয়ারি	বেশ ঠান্ডা, বৃষ্টি হয়নি, আকাশ পরিষ্কার, উত্তর দিক থেকে বাতাস বয়
২। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	
৩। আষাঢ়-শ্রাবণ	
৪। সেপ্টেম্বর - অক্টোবর	
৫। ফেব্রুয়ারি- মার্চ	

দিদিমণি বললেন — বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়জুড়ে কোনো জায়গায় একইরকম আবহাওয়া থাকে। সেটিই হলো ঋতু।

আকাশ বলল— তাহলে যে সময় খুব বৃষ্টি হয় তা হলো বর্ষা ঋতু ?

—ঠিক তাই। এরকম অন্য ঋতুগুলো হলো— গ্রীষ্ম, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত।

বিভিন্ন ঋতু আর ফুল, ফল ও উৎসব

তোমার অঞ্চলের বিভিন্ন ঋতুর ফুল, ফল ও উৎসবের কথা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের ফাঁকা স্থান পূরণ করো। তারপর নীচের তালিকাটি পূরণ করো।

ঋতুর নাম	কী কী ফুল ফোটে	কী কী ফল পাওয়া যায়	কী কী উৎসব হয়
গ্রীষ্ম	জুঁই, ...	আম, ...	রবীন্দ্র জয়ন্তী, বর্ষবরণ, ...
শরৎ			
শীত			
বসন্ত			

দিদিমণি বললেন— বড়ো বড়ো কবিরা এই ঋতু নিয়ে কত গান, কবিতা লিখেছেন। এরকম একটা গানের সঙ্গে আমি একবার নেচেছিলাম—

‘আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে .....’।

অসীমা বলল— আমিও নেচেছি দিদি। গানটা হলো - ‘পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে ছুটে আয় .....’।

নঈম বলল — আমি একটা ঋতুর কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেও পারি— ‘এসেছে শরৎ, হিমের পরশ.....’।

তোমরা এবার ঋতু নিয়ে লেখা গান বড়োদের ও শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে সংগ্রহ করো ও বিভিন্ন ঋতুতে এগুলো গাওয়ার চেষ্টা করো।

ঋতুর নাম	গানের প্রথম লাইন
গ্রীষ্ম	দারুণ অগ্নিবাণে রে .....
বর্ষা	
শরৎ	শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি ...
হেমন্ত	
শীত	শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন .....
বসন্ত	

তোমার যে ঋতু সবচেয়ে ভালো লাগে তার সম্পর্কে লেখো।

ঋতুর পরিচয়	বর্ণনা
১. কোন কোন মাস জুড়ে ওই ঋতু	
২. আবহাওয়া কেমন থাকে	
৩. কোন কোন ফসল ফলে	
৪. কী কী উৎসব হয়	
৫. ওই সময় মানুষ কী কী পোশাক পরে	
৬. ওই সময় কী কী ফুল ফোটে	

আমাদের চারপাশের উদ্ভিদ ও প্রাণী

কলমীশাক

সাপ

কেচোঁ

নারকেল গাছ

বাবুই পাখি ও তার বাসা

মাছ

পলাশফুল

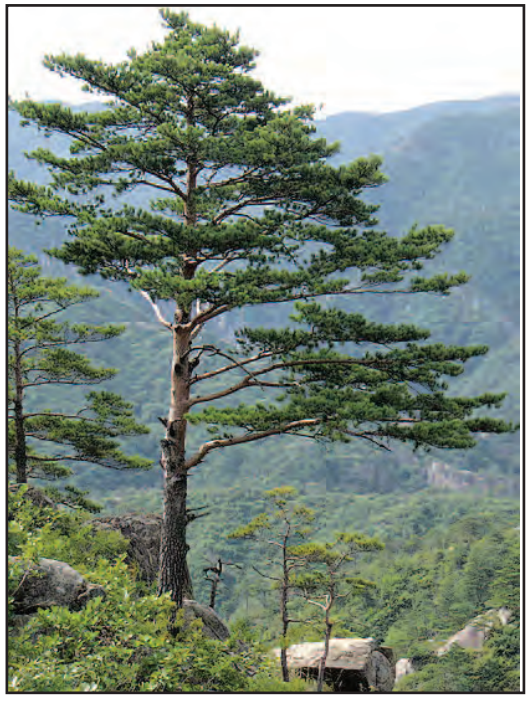

পাইন গাছ

ক্যাকটাস

রেডপান্ডা

বাদাবন

শীতের ছুটির পরে সবাই স্কুলে এসেছে। সমীর বলল— জানিস ছুটিতে বাবা আমাদের একদিন চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেছিলেন। বাঘ, সিংহ, হরিণ, ময়ূর, সাপ, হাতি, বাঁদর, পাখি - কত কী দেখলাম।

আসলাম জিজ্ঞেস করল — চিতা দেখিসনি ?

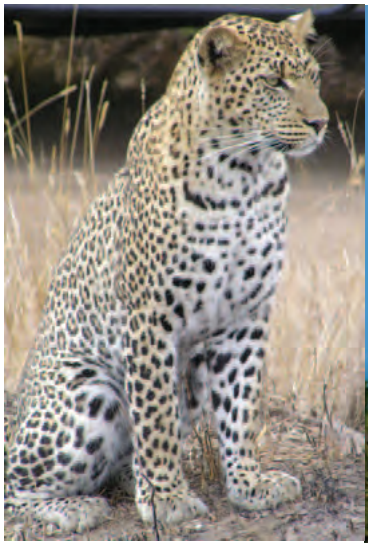

চিতাবাঘ

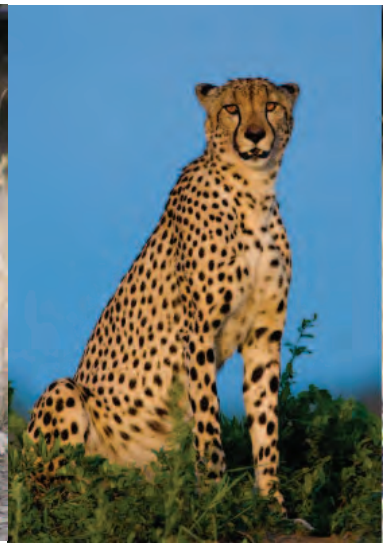

চিতা

সমীর বলল— নারে চিতা দেখিনি, দেখলাম চিতাবাঘ।

আয়েষা বলল— ‘সোনার কেল্লা’ সিনেমায় দেখিসনি, বালির ওপর দিয়ে উট কেমন দৌড়োচ্ছিল।

মানস জিজ্ঞেস করল— উটপাখি কোথায় থাকেরে?

সমীর বলল— খাঁচার গায়ে লেখা ছিল। পরে তোদের বলব।

অ্যালিস জিজ্ঞেস করল — সাপ তো গর্তে থাকে । আমি দেখেছি। চিড়িয়াখানায় সাপ কোথায় দেখলি?

সমীর বলল— একটা ঘরের মধ্যে খোপ খোপ করা ছিল। খোপের সামনে দেখার জন্য কাচ দেওয়া ছিল।

বৈশাখী বলল— বাঘ, সিংহও তো আসলে জঙ্গলে থাকে। চিড়িয়াখানায় না হয় খাঁচায় থাকে।

চিতাবাঘ চিতা

আসলামের মনে প্রশ্ন— আচ্ছা একই বনে বাঘ, সিংহ সবাই কী একসঙ্গে থাকে? স্যারকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

ক্লাসে আসলাম স্যারকে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করল। স্যার বললেন— দাঁড়াও আগে তোমাদের কয়েকটা ছবি দেখাই।

ছবি দেখেই সোনম চেঁচিয়ে উঠল—আরে এটা তো রেডপান্ডা। দার্জিলিঙে মামার বাড়িতে গিয়ে দেখেছি।

আরেকটা ছবি দেখে সমীর বলল— এ তো বাবুই পাখির বাসা। জলিলচাচার বাড়ির তালগাছগুলোতেই তো এরকম কত ঝুলে আছে।

বৈশাখী বলল— আর এটা তো কলমিশাক। আমাদের পুকুরের ধারেই তো কত হয়ে আছে।

স্যার জিজ্ঞেস করলেন- আসলামের প্রশ্নের উত্তর কী হবে বলোতো এবারে ?

সোনম বলল — বিভিন্ন প্রাণী আর উদ্ভিদের থাকার জায়গা আলাদা আলাদা। কেউ থাকে জঙ্গলে, কেউ বা আবার জলে, কেউ আবার গর্ত খুঁড়ে তার ভিতরে থাকে।

স্যার বললেন— আমাদের দেশে বাঘ আর সিংহ থাকে আলাদা আলাদা জঙ্গলে। একসময় মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে সিংহ আর চিতা একসঙ্গে থাকত। মানুষের অত্যাচারে ওই জঙ্গল থেকে ওরা একদিন হারিয়ে গেল। এখন ওদের ভারতের কোথায় দেখা যায় বলতে পারবে কি?

আয়েষা জিজ্ঞেস করল— চিতা মানে তাহলে চিতাবাঘ নয়।

— না। ঠিক যেমন শালিখ আর ময়না এক নয়।

তোমরা এবার আগের ছবিগুলো ভালো করে দেখো। আর ছবির উদ্ভিদ আর প্রাণীদের নাম লেখ। চিনতে পারলে তাদের থাকার জায়গাগুলি লিখে ফেলো।

ক্রমিক নং	উদ্ভিদের নাম	থাকার জায়গা	ক্রমিক নং	প্রাণীর নাম	থাকার জায়গা
১.	কলমিশাক		১.	বাবুই	
২.			২.		
৩.			৩.		
৪.			৪.		
৫.			৫.		
৬.			৬.		
৭.			৭.		
৮.			৮.		

কোথায় থাকে তারা

স্যার বললেন— জীবের থাকার জায়গার ছবিগুলো দেখো। ছবিগুলো দেখে তোমাদের কী মনে হলো?

আয়েষা বলল— সব জায়গা তো আমদের বাড়ির চারপাশের মতো নয়। কোথাও খুব উঁচু। কোথাও নীল জলে বড়ো বড়ো ঢেউ। আবার কোথাও বা সাদা বরফ।

— ঠিকই। এই পৃথিবীর সব জায়গা আমাদের এলাকার মতো নয়।

জলিল বলল— উদ্ভিদ আর প্রাণীদের থাকার এতরকম জায়গাও আছে পৃথিবীতে!

স্যার বললেন— জীবেরা এত বিচিত্র পরিবেশে বাস করে কী করে, বলতে পারবে কি?

নীচের ছবিগুলো দেখো। ছবিতে দেখানো এই এতরকম জায়গাতে বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তুরা থাকে। ওই জায়গাগুলো চেনার চেষ্টা করো।

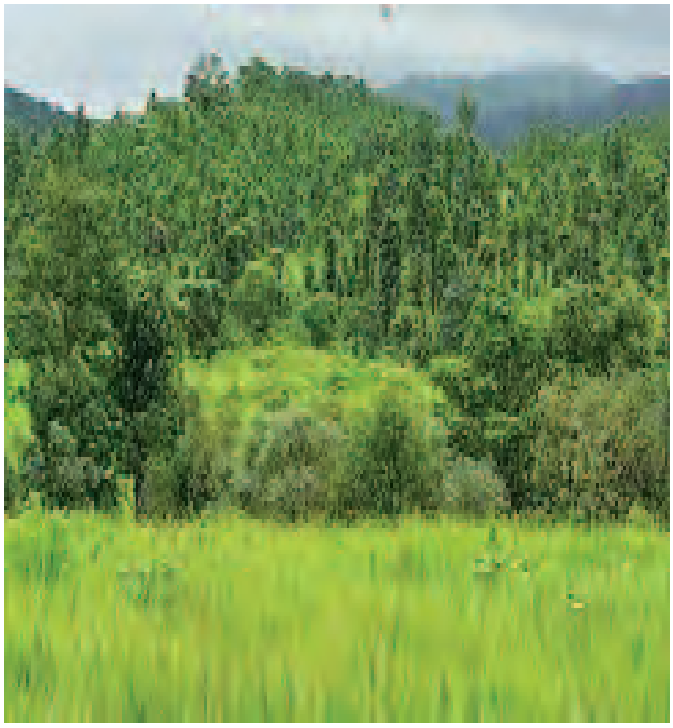

আবহাওয়া ও বাসস্থান

বৈশাখীরা বলল--- আসলে কোনো প্রাণীর হয়তো সমুদ্রের নোনা জলে থাকতে সুবিধে হয়, কেউ আবার হয়তো পুকুরের মিষ্টি জলে মানিয়ে নিয়েছে। কোনো উদ্ভিদ হয়তো পাথুরে মাটিতে ভালো জন্মায়, অন্য আরেকটা উদ্ভিদ হয়তো আবার আমাদের বাড়ির পাশের পুকুরধারে স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে ভালো জন্মায়।

প্রবাল প্রাচীর

— খুব ভালো বলেছ। তার মানে যেখানে জীবদের বাস করার অনুকূল পরিবেশ থাকে, সেখানেই সে থাকে। সেটাই তার বাসস্থান। একটা পচা কাঠ উলটে দেখো। দেখবে কিলবিল করে কিসব পোকা বেরোচ্ছে। আবার মানুষের মাথার চুলে থাকে উকুন, খাবারের নালীতে থাকে কৃমি, গন্ডারের পিঠে থাকে পোকা। এগুলো সবই এক এক ধরনের বাসস্থান।

এই কথা শুনে সমীর বলল— কয়েকদিন আগে আমার ম্যালেরিয়া হয়েছিল। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন যে রক্তে নাকি জীবাণু বাসা বেঁধেছে।

— ঠিক বলেছ। আমাদের দেহের খাবারের নালি, ফুসফুস, চোখ, কানের মতো সব অঙ্গেই জীবাণুরা থাকতে পারে। বিভিন্ন উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীবের দেহেও জীবাণুরা থাকে।

ওপরের আলোচনা থেকে তোমরা বুঝতে পারলে যে শুধু ফাঁকা জায়গা হলেই তা বাসস্থানের অনুকূল নাও হতে পারে। এজন্যই কি মরুভূমিতে কাঁটা গাছ আর উট ছাড়া সেরকম কোনো জীবজন্তু চোখে পড়ে না? যে অঞ্চলে অনেক জীব থাকে তারা একে অপরের বেঁচে থাকার অনুকূল বাসস্থান তৈরি করে দেয়। ঘন বন বা সমুদ্রের নীচে প্রবাল প্রাচীরে এই ঘটনাই ঘটে।

আগের পাতার ছবি দেখে জীবদের থাকার নানারকম জায়গার নাম লেখো।

জীবের নাম	জীবদের থাকার নানারকম জায়গা নাম
১. উট ২.	

তোমার জানা এরকম কতগুলো উদাহরণ দাও যেখানে একটি জীব অন্য আর একটি জীবের বাসস্থান তৈরি করে দেয়।

বিষয়	উদাহরণ
১. একটা উদ্ভিদ আরেকটা উদ্ভিদের বাসস্থান তৈরি করে	১. খেজুর গাছ ..... গাছের বাসস্থান।
২. একটা উদ্ভিদ আরেকটা প্রাণীর বাসস্থান তৈরি করে	২.
৩. একটা প্রাণী আরেকটা প্রাণীর বাসস্থান তৈরি করে	৩.

সমীর এবারের ছুটিতে গুজরাটে বেড়াতে যাবে। উত্তেজনায় কয়েকদিন ধরে ওর ঘুম আসছে না। শেষ পর্যন্ত ছবির সিংহকে স্বচক্ষে দেখবে। স্যার বললেন— ভারতীয় সিংহ, একমাত্র গুজরাটের গির অরণ্যেই পাওয়া যায়। এইরকমই আর একটা প্রাণী হলো আসামের মুগা রেশম মথ। এদের বাসস্থান কমতে কমতে ওই এক জায়গায় এসে থমকে গেছে। যদি ভবিষ্যতে এই জায়গাটা থেকেও এরা হারিয়ে যায় তবে আর এদের দেখতে পাওয়া যাবে না।

সিংহ

মুগা রেশম মথের শূককীট

নীচের ছবিগুলো দেখে বোঝার চেষ্টা করো ওই প্রাণীগুলো কোন কোন বাসস্থানে থাকে বা থাকতে পারে ।

প্রাণীর নাম	যেসব জায়গায় দেখতে পাবে
১. বাঘ	১. বাদাবন, ...
২. কাক	২. আস্তাকুঁড়, ...
৩. কচ্ছপ	৩.
৪. চড়াই পাখি	৪. বাড়ির ঘুলঘুলি, ঘরের চালের নীচে, ...
৫. আরশোলা	৫.
৬. গোসাপ	৬.

থাকার জায়গা যাচ্ছে হারিয়ে

স্যার বললেন— সেদিন একটা খবরের কাগজ থেকে 'বিপন্ন বাসভূমি' নামে একটা লেখা তোমাদের পড়ে শুনিয়েছিলাম। মনে আছে কি ?

স্যারের প্রশ্নের উত্তরে সোনম বলল— চারদিকে শহর বাড়ছে। জলাভূমি বুজে যাচ্ছে। আকাশ থেকে সুন্দরবনকে দেখলে নাকি মাথার টাকের মতো লাগে।

সোনম দম নেওয়ার জন্য একটু থামতেই আয়েষা বলে উঠল—আমিও বলব স্যার।

— হ্যাঁ, তুমিও বলো।

আয়েষা বলতে আরম্ভ করল— জঙ্গলের অনেক গাছ রোজ কাটা পড়ছে। বাড়ির আশেপাশে শিমুল গাছ থাকলে অনেকে আবার কুসংস্কারের বশে সেটা কেটে ফেলে। উঁচু ঘাসজমি ও জলার ঘাসজমি ক্রমশ কমছে।

স্যার বললেন— ঠিক বলেছ।

এসব শুনে সমীররা গভীর চিন্তায় পড়ে গেল। তবে কি একদিন এই পৃথিবীর সব বাসস্থানই এভাবে হারিয়ে যাবে? মানুষ তখন যাবে কোথায়? এই উদ্ভিদ আর প্রাণীদের ওপর নির্ভর করেই তো মানুষের বেঁচে থাকা। তাই বিভিন্ন জীবের বাসস্থান বাঁচানোর ওপর ওরা একটা পোস্টার তৈরি করবে বলে ঠিক করল। পোস্টারের মাধ্যমে ওদের অঞ্চলের বিপন্ন উদ্ভিদ আর প্রাণীদের কেন বাঁচানো দরকার সেই বিষয়ে ওরা সবাইকে জানানোর চেষ্টা করবে।

অচেনা জায়গা

পরীক্ষার পরে দারুণ মজা

স্কুলের পরীক্ষা শেষ হয়েছে কালই। দাদার সঙ্গে বাসে করে মাসির বাড়ি যাচ্ছে বুবুন। একটা ব্রিজে ওঠার পর বুবুন দাদাকে জিজ্ঞাসা করল— এই নদীটার নাম কী?

দাদা বললেন— হুগলি নদী। হাওড়া আর কলকাতার মধ্যে যোগাযোগ করে দিয়েছে এই ব্রিজ। এর নাম রবীন্দ্র সেতু। বুবুনের খুব মজা হচ্ছিল। বাস এসে থামল হাওড়া স্টেশনের পাশে। ট্রেনে ওঠার কিছুক্ষণ পর হুইসল দিয়ে

ট্রেন ছেড়ে দিল। এক সময়ে স্টেশন এল। বুবুন দেখল বিরাট স্টেশন। বেশ ফাঁকা ফাঁকা। কলকাতার মতো ঘিঞ্জি নয়। বুবুনের বেশ ভালো লাগছিল। গন্ধটাও অন্যরকমের। ওর ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল। ওরা দুজন হাঁটছিল। দু-পাশে পুকুর। পুকুরে ছোটো ছোটো পানা ভরতি। তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা। চারিদিকে কতরকম গাছ। দাদা একটা গাছ দেখিয়ে বললেন—এটা ফলসা গাছ। বুবুন বলল—ফলসা কী গো? দাদা গাছ থেকে কয়েকটি ফলসা পাড়লেন। ছোটো ছোটো ফল। মুখে দিতেই যেন গলে গেল। বেশ মিষ্টি। তবে দানা আছে। বুবুনের দারুণ লাগছিল। আগে এমন জায়গায় ও কোনোদিন আসেনি।

বুবুনের বেড়ানোর গল্প পড়ে কেমন লাগল তোমাদের?

তোমরা নীচের ফাঁকা স্থান পূরণ করো।

শেষ যেখানে বেড়াতে গেছ	কীভাবে গিয়েছিলে	কতদিন থেকেছ	কী কী দেখেছ	তোমার কেমন লেগেছে	সেই এলাকার কাছাকাছি কোনো বিখ্যাত জায়গার নাম

সাঁতরাগাছির ঝিলে পরিযায়ী পাখি

বুবুনের মনে পড়ল আজকে ওদের পাখি দেখতে যাওয়ার কথা হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছিতে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল বুবুন। হাঁটতে হাঁটতে ওরা স্টেশনে এল। ট্রেনে চেপে ওরা পৌঁছোল সাঁতরাগাছিতে। ট্রেনলাইনের পাশ দিয়ে রাস্তা। কিছু দূর হেঁটে ওরা পৌঁছোল ঝিলের ধারে। ও বাবা ঝিল কোথায়? এ তো পানা ভরতি! বুবুন ভেবেছিল ঝিলে অনেক জল থাকবে । আর সেখানে অনেক পাখির আনাগোনা হবে। খানিক পরেই একদল বকের মতো পাখিকে উড়ে আসতে দেখল। দাদাকে জিজ্ঞাসা করল— ওগুলো কী পাখি? দাদা বললেন— ওগুলো নানা জাতের হাঁস। কোনোটা পিনটেল, কোনোটা আবার হুইসলিং টীল। দূর দেশ থেকে আসে। আগে আরও পাখি আসত। কিন্তু এখন তো জল বেশ নোংরা হয়ে গেছে। তাই ওদের

আনাগোনাও কমে গেছে। বুবুনের মনে পড়ল বাবার সঙ্গে একদিন ও গোলপার্কের লেকে গিয়েছিল। ওখানে প্রচুর মাছ দেখেছিল। ও ভাবল, একদিন যদি ওখানেও কচুরিপানায় ভরে যায়, তাহলে সব মাছ মরে যাবে। এমনসময় একটা হুইসলিং টীল ওর একদম সামনে এসে বসল। বুবুন ঠিক করল, বাড়ি ফিরেই হাঁসটির ছবি আঁকবে। আর বড়ো হলে একটা ক্যামেরা কিনবে। আর পাখিদের ছবি তুলবে।

এবার বাড়ির বড়োদের/এলাকার মানুষজনের/শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে লিখে ফেলো।।

তোমার স্কুলের/ বাড়ির/ বেড়াতে যাওয়া জায়গার কাছের ঝিলের নাম	সেখানকার গাছপালার নাম	সেখানকার দেখা প্রাণীর নাম	সেখানকার দেখা পাখির নাম

চেনা তবু অচেনা

স্যার বললেন--- আমি একবার আসাম বেড়াতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ট্রেন কী কারণে হাসিমারা স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুনলাম ট্রেন আজ আর ছাড়বে না। গন্তব্য পাল্টে ট্রেন থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। দূরে কালো পাহাড় আর ঘন জঙ্গল। একটু এগোতেই পেলাম চাবাগান। আগে কোনোদিন এ রাস্তায় আসিনি।

কিছুদূর এগিয়েই দেখা হলো এক চা বাগানের শ্রমিকের সঙ্গে। তিনি আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। তাঁদের ভাষা বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল। কয়েকঘণ্টা পরেই আশেপাশে

সবার সঙ্গে ভাব হলো। ওনার নাম নরেশ রাভা। বাড়ি থেকে একটু এগোলেই নাকি এক বিরাট নদী। তার পাড়ে ঘাসের জঙ্গল। সেখানে নাকি এক খড়্গওলা জন্তু থাকে।

পরের দিন ভোর ভোর বেরিয়ে পড়লাম বন আর নদী দেখতে। বনে ঢুকতেই দেখা মিলল এক দাঁতাল হাতির সঙ্গে। তারপর হরিণ, বাইসন আরও কত পাখি। কিন্তু যার জন্য আসা তার দেখা মিলল না। নরেশ বললেন - দূরে যে ঘাসজঙ্গল দেখছেন ওখানেই ওরা বেশি থাকে। অনেকক্ষণ টাওয়ারে অপেক্ষা করার পর হঠাৎ ঘাসের জঙ্গল নড়ে উঠল। তারপর বেরিয়ে এল বাচ্চা নিয়ে ওই জন্তু। আরে, এ তো ছবিতে দেখা সেই গন্ডার। তবে আমি কোথায় এসেছি?

নরেশ বললেন— এ জঙ্গল হলো জলদাপাড়া। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বইছে হলং নদী। আর জঙ্গলের আর একদিকে আছে তোর্সা নদী।

তিন-চার দিন আমার জঙ্গলের পশুপাখি আর চা বাগান দেখে সময় কেটে গেল। একদিন এক পাথুরে রাস্তায় নদীর ধার বরাবর ওরা নিয়ে গেল ভুটানের কাছাকাছি এক জায়গায়। সেখানে টোটোদের সঙ্গে দেখা হলো। এদের ভাষা, চেহারা, খাবার এসবই আমার অজানা ছিল। বইতে পড়া পুরোনো সমাজের সঙ্গে ওদের অনেক মিল খুঁজে পেলাম।

নরেশ বললেন— আমাদের এখানে ঘুরলে আপনি এরকম বহু অজানা, অচেনা মানুষের এবং জায়গার খোঁজ পাবেন। সন্ধেবেলা হতেই নরেশদের পাড়ায় নাচ-গানের অনুষ্ঠান। মেয়েরা জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে রাভা নৃত্য দেখাল। সেই নাচ যেমন বর্ণময়, তেমনই দলগত। পাশের পাড়ায় গেলে আপনি মেচদের মাছ ধরার নাচ দেখতে পাবেন।

দিন-রাত

১১টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজল। এবার ক্লাস শুরু হবে। রুকসানা, রাহুল আর রাখি বসেছিল জানালার ধারে একটা বেঞ্চে। জানালা দিয়ে রোদ আসায় রাহুলের ছায়াটা রুকসানার খাতার ওপর পড়ছে। রুকসানার অসুবিধা হচ্ছে। ও বারবার রাহুলকে বলছে — আলোটা একটু ছাড় না। রাহুল বলল— আমি কী ইচ্ছা করে করছি, জানালা দিয়ে রোদ এলে আমি কী করব। দিদিমণি শুনতে পেয়ে বললেন— তোমরা ঝগড়া কোরো না, আর একটু পর ওই ছায়া আর থাকবে না।

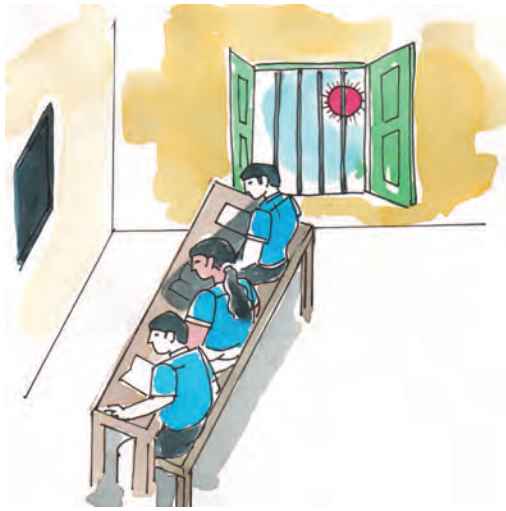

এরপর ক্লাসের শেষ হবার পর দিদিমণি ক্লাস শেষ করে চলে গেলেন।

কী আশ্চর্য! কিছুক্ষণ পর জানালা দিয়ে আসা রোদ উধাও। সঙ্গে সঙ্গে, ছায়াও উধাও।

ওরা এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল। ঠিক করল পরদিন ক্লাসে দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করবে।

পরদিন দিদিমণি ক্লাসে এলে রাহুল ওই কারণটা জানতে চাইল। দিদিমণি বললেন— তোমাদের মনে আছে, তোমরা তৃতীয় শ্রেণিতে ছায়া নিয়ে কত খেলা করেছ।

রুকসানা বলল — হ্যাঁ, দিদিমণি খুব মনে আছে। আমাদের ছায়া যেদিকে পড়ে তার উলটোদিকে থাকে সূর্য।

রাহুল বলল — সকালবেলা আমাদের ছায়া পড়ে পশ্চিম দিকে। তার মানে সূর্য থাকে পূর্ব দিকে।

— ঠিক বলেছ রাহুল।

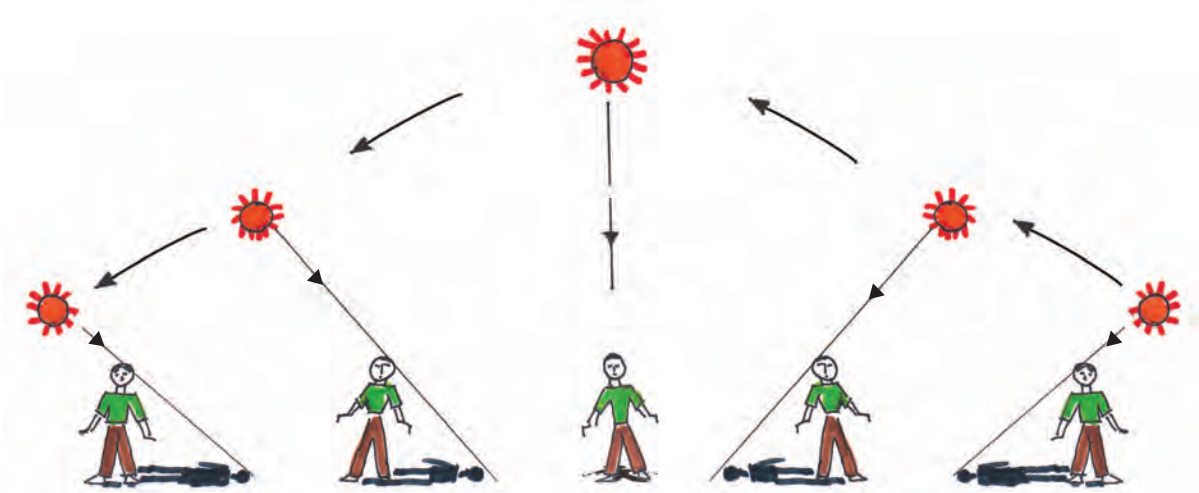

আলোচনা করে নীচে লেখো।

তোমার ছায়া	কখন	কোন দিকে গঠিত হয়	তখন সূর্যের অবস্থান
দৈর্ঘ্য সবচেয়ে ছোটো			
দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড়ো			
ক্রমে ছোটো থেকে বড়ো			
ক্রমে বড়ো থেকে ছোটো			

সবাই ফাঁকা জায়গা পূরণ করে দিদিমণিকে দেখাল। দিদিমণি এবার জিজ্ঞেসা করলেন — তোমাদের তাহলে কী মনে হয়? কেন এমন হলো?

—সূর্যকে তো এক এক সময় এক এক দিকে দেখা যায়। তাই আমাদের ছায়াও কখনও পূর্বে কখনও পশ্চিমে গঠিত হয়। ছায়া কখনও ছোটো কখনও বড়ো হয়।

দিদিমণি হাসলেন। বললেন— এসো আমরা একটা মজার খেলা খেলি। এই বলে দিদিমণি একটা কলমদানি, একটা কলম আর একটা বড়ো মুখের টর্চ ব্যাগ থেকে বার করলেন।

এরপর কলমসহ কলমদানিটা টেবিলের পূর্বপ্রান্তে রাখলেন (ছবিতে দেখো)। ঘর অন্ধকার করে দেওয়া হলো। ইকবাল জ্বালানো টর্চটাকে ছবির মতো করে টেবিলের অনেকটা ওপরে ধরল।

এবার দিদিমণি টেবিলকে ধীরে ধীরে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে (সমান মেঝের ওপর) ঠেলতে থাকলেন। বললেন— তোমরা সবাই কলমের ছায়াটাকে লক্ষ করো। কলমটা যখন টর্চকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল, দিদিমণি খেলা শেষ করলেন।

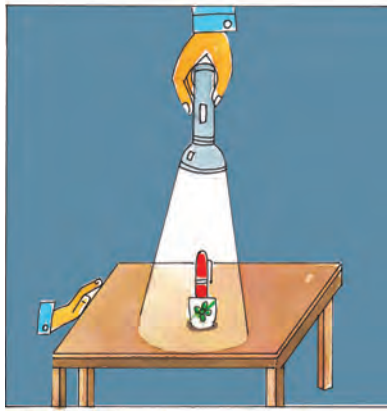

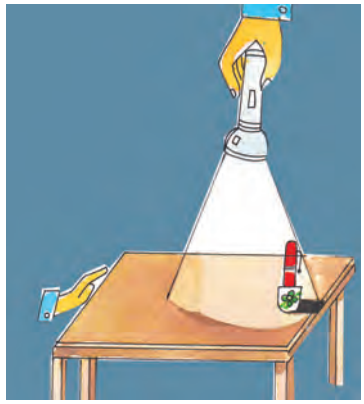

সমতল (সমান) মেঝে ও হালকা টেবিল না পাওয়া গেলে, টেবিল বা বেঞ্চির ওপর একটা টেবিলক্লথ বা যে কোনো কাপড় পেতে, ওই কাপড়কে পূর্ব দিক থেকে টেনে কাজটা করা যায়।

বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচে লিখে ফেলো

কলমের ছায়া	কলমের কোন দিকে ছায়া গঠিত হচ্ছে	তখন টর্চের অবস্থান (কলমের কোন দিকে)
দৈর্ঘ্য সবচেয়ে ছোটো		
দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড়ো		
ক্রমে বড়ো থেকে ছোটো হচ্ছে		
ক্রমে ছোটো থেকে বড়ো হচ্ছে		

ছবিটি দেখো। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো

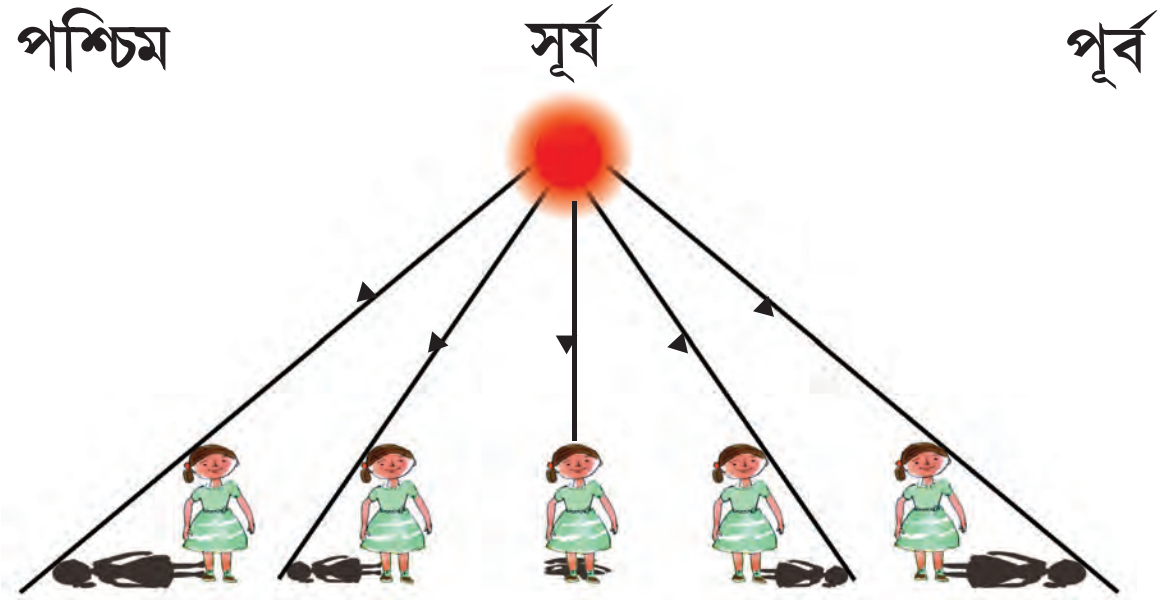

দিদিমণি বললেন— আগের তালিকা দুটি থেকে, তোমার ছায়ার আর কলমের ছায়ার কোনো মিল পাচ্ছ কিনা।

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল— হুবহু একরকম দিদিমণি।

দিদিমণি বললেন— ধরো, টর্চটা হলো সূর্য। কলমদানি সহ কলম হলো তুমি। টেবিলটা হলো পৃথিবী। তাহলে ভেবে বলো দেখি তোমার ছায়ার এরকম আচরণের কারণ কী?

রুকসানা বলল— দিদিমণি, এখানে টর্চটা স্থির, তার মানে সূর্যটা স্থির থাকে। আর টেবিলটা সরানো হচ্ছিল। তার

মানে পৃথিবীটা গতিশীল। তাই ছায়ার আচরণ ওইরকম হয়।

—ঠিক বলেছ। কিন্তু একটু পার্থক্য আছে? টেবিলটা টর্চের নীচ দিয়ে সোজাসুজি সরানো হচ্ছে। পৃথিবী কিন্তু সূর্যের সাপেক্ষে সোজাসুজি যাচ্ছে না, ঘুরছে। এবার বলোতো তোমরা সূর্যকে দিনের বেলা দেখতে পাও। রাতে সূর্যকে দেখতে পাও না কেন?

রাহুল বলল— রাত্রে আকাশে তো সূর্যটাই থাকে না। তাহলে রাতে সূর্য কোথায় যায়? সূর্য তো স্থির।

সবাই একসঙ্গে বলল — তাহলে কারণটা কী দিদিমণি?

—কারণটা জানতে হলে এসো আর একটা খেলা খেলি।

দিদিমণি ক্লাসের সবাইকে স্কুলের সামনের দিকে মাঠে নিয়ে গেলেন, তারপর সবাইকে এক এক করে, স্কুলের সামনে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দু-এক পাক ঘুরতে বললেন।

একবার পুরো পাক দিতে, তুমি স্কুলকে কতবার দেখতে পেলে	স্কুলটাকে কখন দেখতে পেয়েছ	স্কুলটাকে কখন দেখতে পাওনি

এবার দিদিমণি বললেন— তুমি স্কুলটাকে কখনও দেখতে পেয়েছ আবার কখনও দেখতে পাওনি। কারণ- তুমি পাক খাওয়ার সময় স্কুল একবার তোমার সামনে, একবার তোমার পিছনে পড়েছে।

রাখি বলল--- দিদিমণি, তাহলে পৃথিবীটাও কি ওইরকমভাবে পাক খায়?

দিদিমণি বললেন— ঠিক ধরেছ রাখি। তুমি পৃথিবীর যেখানে আছ, পৃথিবী পাক খায় বলে সেই জায়গাটা একসময় সূর্যের সামনে এসে পড়ে। তখন তুমি সূর্যকে দেখতে পাও। তখন হয় দিন।

রুকসানা বলল — দিদিমণি, তাহলে পৃথিবী ঘুরছে বলে সেই জায়গাটা আবার সূর্যের উলটো দিকে চলে যায়। তখন আমরা সূর্যকে দেখতে পাই না। সেটাই রাত্রি তাই না?

দিদিমণি বললেন— ঠিকই বলেছ। দিন-রাত নিয়ে আমরা পরের দিন আরো বেশি করে আলোচনা করব।

পরদিন দিদিমণি ক্লাসে এসে একটা বড়ো ব্যাগ থেকে কিছু জিনিসপত্র বার করলেন। তার মধ্যে রয়েছে একটা বড়ো বল, একটা শক্ত সুতোর রিল, স্কেচ-পেন আর একটা টর্চ।

রাখি বলল— দিদিমণি এগুলো দিয়ে কী হবে?

— আমরা এখন দিনরাত্রি খেলা খেলব। তোমাদের মধ্যে যে কেউ একজন আমার কাছে এসো।

রাহুল দৌড়ে উপস্থিত হলো দিদিমণির কাছে।

দিদিমণি বললেন— বলটার মাঝ বরাবর বলটাকে ঘিরে একলাইনে '**ক**' থেকে '**চ**' অবধি লিখে ফেলোতো।

দিদিমণি সুতোটা দিয়ে বলটাকে ভালো করে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন (ছবিতে দেখো)।

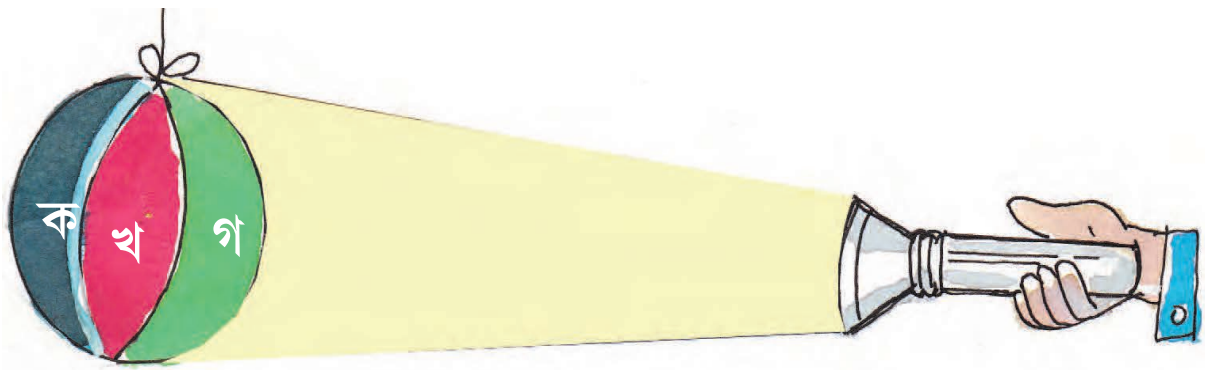

ঘর পুরো অন্ধকার করে দেওয়া হলো। তারপর দিদিমণি রুকসানাকে বলটার ওপর টর্চের আলো ফেলতে বললেন। রুকসানা বলটার কিছুটা কাছ থেকে বলটার ওপর ছবির মতো পাশ থেকে টর্চের আলো ফেলল।

দিদিমণি অসীমাকে বললেন— বলটাকে তুমি খুব আস্তে একবার মাত্র লাট্টুর মতো ঘুরিয়ে দাও। খেয়াল রাখো বলটা যেন দোলা না খায়।

অসীমা তাই করল।

দিদিমণি বললেন— সবাই বলটার দিকে লক্ষ রাখো। আর খেয়াল করো বাংলা বর্ণগুলোকে। দেখো কোন কোন বর্ণগুলোর ওপর টর্চের আলো পড়ছে। আর তখন কোনগুলোর ওপর টর্চের আলো পড়ছে না।

রাখি বলল— সবকটা বর্ণ একসঙ্গে আলোকিত হচ্ছে না। একবার বলের একদিকের বর্ণগুলো আলোকিত হচ্ছে, অন্যগুলো তখন অন্ধকারে ঢাকা থাকছে। পরমুহূর্তেই অন্ধকারে থাকা বর্ণগুলো আলোকিত হচ্ছে। আর

আলোকিত বর্ণগুলো চলে যাচ্ছে অন্ধকারে। তখন তাদের দেখাই যাচ্ছে না।

দিদিমণি বললেন— পৃথিবীর ক্ষেত্রেও এমনই হয়। স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে পাক খাওয়ার খেলাটা এবার মনে করো। তোমরা জানতে পেরেছ পৃথিবী নিজের চারিদিকে পাক খায়। এর ফলে অর্ধেকটা এক সময়ে সূর্যের দিকে থাকে। তখন সেই জায়গা সূর্যের আলো পায়।

সুজয় বলল— তখন নিশ্চয়ই ওই জায়গায় দিন।

— ঠিক তাই।

শীতল বলল— পৃথিবীর যে জায়গায় দিন হয়, তার উলটো দিকে নিশ্চয়ই রাত হয়। কারণ তখন ওই জায়গায় তো সূর্যের আলো পৌঁছোয় না। তাই ওই জায়গা থাকে অন্ধকার।

সুজয় বলল— ভোরবেলা আর সন্ধ্যাবেলা ঝলমলে আলো থাকে না কেন?

দিদিমণি বললেন— খুব ভালো ভেবেছ। রাত শেষ হয়ে দিনের শুরু হলো ভোরবেলা। আরেকটু পরে পৃথিবী পাক খাওয়ার জন্য তোমার জায়গাটায় হবে সকাল।

এবার শীতল বলল— তাহলে দিন শেষ হয়ে রাতের শুরু

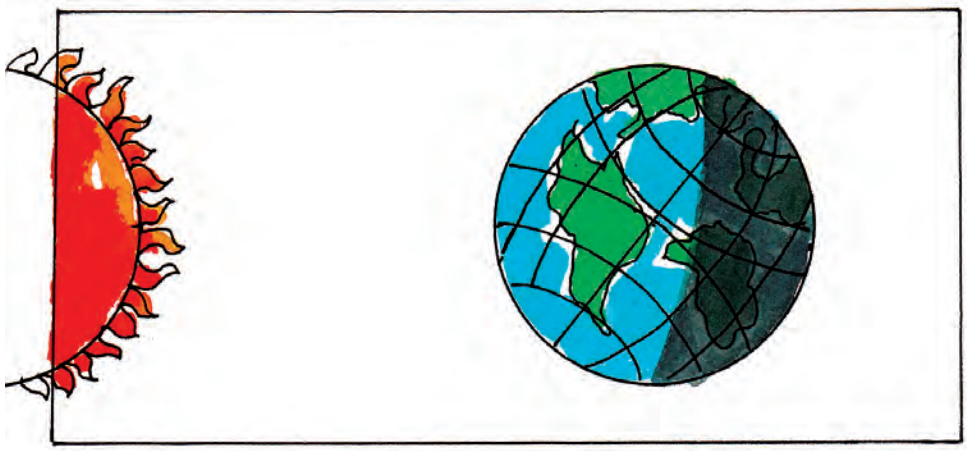

হলো সন্ধ্যাবেলা। পৃথিবী পাক খাওয়ার জন্য আমার জায়গায় আরেকটু পরে অন্ধকার হয়ে যাবে।

দিদিমণি বললেন— গরমকালে তুমি যখন ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠো, তখন কি ঝলমলে আলো দেখতে পাও?

অসীমা বলল— হ্যাঁ, ভোর পাঁচটার সময় ভালোই রোদ উঠে যায়। কিন্তু শীতকালে ভোর পাঁচটার সময় রীতিমতো অন্ধকারই থাকে। আবছা আবছা আলোর আভাস থাকে।

— তুমি ঠিকই বলেছ। এবার বলো, গরমকালে বিকেলে তুমি বেশি খেলার সময় পাও, না শীতকালে?

রাখি বলল— গরমকাল। তখন প্রায় সাড়ে ছটার পর সন্ধ্যা হয়। কিন্তু শীতকালে ছটাতেই প্রায় অন্ধকার হয়ে যায়। শীতকালে অনেক আগেই সন্ধ্যা নেমে যায়।

— তাহলে ভেবে বলোতো, কোন সময় দিন বড়ো রাত ছোটো- আবার কোন সময় এর ঠিক উলটোটা?

রুকসানা বলল — এ তো সবাই জানে গরমকালে দিন বড়ো আর রাত ছোটো, আর শীতকালে এর ঠিক উলটোটা।

চাঁদ

পরদিন দিদিমণি ক্লাসে একটা চাঁদনি রাতের ছবি দেখালেন। সবাইকে বললেন, ওই ছবিটা দেখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

সন্ধ্যামণি বলল— কী সুন্দর দৃশ্য ! চাঁদের আলোয় সব কিছু কেমন রুপোলি হয়ে উঠেছে।

দিদিমণি— তুমি ঠিকই বলেছ দৃশ্যটা সত্যিই সুন্দর। চাঁদের নিজের কোনো আলো নেই। সূর্যের আলো চাঁদের উপর পড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ওটাকেই আমরা চাঁদের আলো বলি।

প্রত্যুষ বলল — আচ্ছা দিদি চাঁদের গায়ে কালো কালো দাগ কীসের?

— আমাদের পৃথিবীর মতো চাঁদেও পাহাড় আছে। আর আছে বড়ো বড়ো গর্ত।

আলম বলল— তাহলে ওইগুলোকে দেখতে পাই না কেন?

— দেখতে পাও তো! ওগুলোকেই তোমরা কালো কালো দাগ হিসাবে দেখো। ঘুড়ি যখন অনেক উঁচুতে চলে যায় তখন তাকে কী আর বড়ো দেখায়। ছোটো বিন্দুর মতো দেখায়।

আলম বলল — বুঝতে পেরেছি, চাঁদ পৃথিবীর থেকে অনেক দূরে থাকায় ওগুলোকে আমরা কালো কালো দাগের মতো দেখি।

— ঠিক তাই। এই দাগগুলোকে আমরা বলি **চাঁদের কলঙ্ক** ।

বিপুল বলল— সারা বছরই ওই দাগগুলো চাঁদের গায়ে একই জায়গায় দেখা যায়।

— আসলে আমরা সবসময় চাঁদের একটা পিঠই দেখতে পাই।

আলম বলল — দিদিমণি চাঁদকে সরে সরে যেতে দেখি কেন!

— চাঁদ হলো পৃথিবীর উপগ্রহ। চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে অনবরত ঘুরছে। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে।

প্রত্যুষ বলল— আচ্ছা দিদিমণি, চাঁদকে আমরা নানারকম আকারে দেখি কেন? কখনও গোল রুপোলি থালার মতো। কখনও কাস্তের মতো। কখনও আবার কমলালেবুর কোয়ার মতো।

— চমৎকার প্রশ্ন করেছ। এর উত্তর খুঁজতে চলো আমরা একটা খেলা খেলি।

টেবিলের ওপর একটা বড়ো বল রাখো। বলটা থেকে কিছুটা দূরে একটা টর্চ জ্বালিয়ে রাখো। টর্চের আলো যেন ভালোভাবে বলের উপর পড়তে পারে। ঘর যতটা সম্ভব

অন্ধকার করে দাও। এবার একটু দূরে গিয়ে বলটাকে চারপাশ থেকে দেখো।

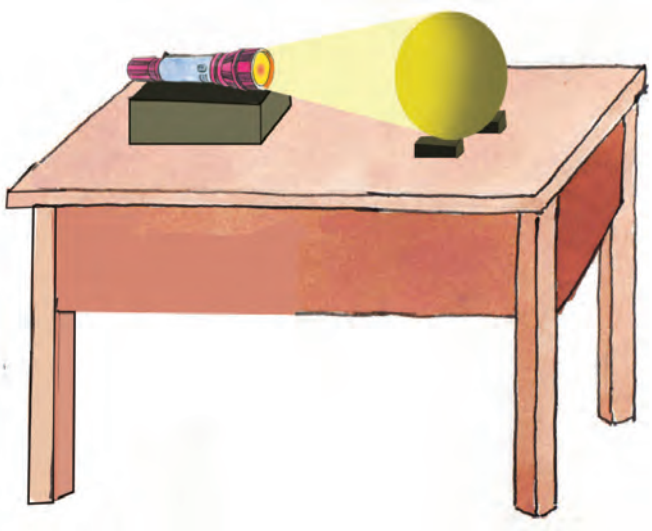

এবার নানান দিক থেকে তুমি বলটাকে কেমন দেখতে পাচ্ছ তা খাতায় এঁকে ফেলো।

দিদিমণি বললেন— চাঁদ তো পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে থাকে। কিন্তু সূর্যের আলোয় চাঁদের একটা পিঠ সবসময় আলোকিত হয়।

প্রত্যুষ বলল — চাঁদ তো সরে সরে যাচ্ছে তাহলে ওই আলোকিত অংশও নিশ্চয়ই বদলে যাবে।

— বাঃ, ঠিক বলেছ। এমনটাই তো হয়। তাই পৃথিবী থেকে চাঁদের আলোকিত যে অংশটুকু আমরা দেখি, তা কখনও গোল কখনও কাস্তের মতো আবার কখনও বা কমলালেবুর কোয়ার মতো।

আলম বলল — পূর্ণিমার সময় আমরা চাঁদটাকে গোল থালার মতো দেখি কেন?

— চাঁদের যে দিকটা সূর্যের পুরো আলো পায় , তার পুরোটাই আমরা দেখতে পাই, তখন চাঁদকে ওরকম গোল দেখায় এটাই হলো পূর্ণিমা।

বিপুল বলল— অমাবস্যায় চাঁদকে দেখতে পাই না কেন?

— চাঁদের দিকে তাকালে যে পিঠটা আমরা দেখতে পাই অমাবস্যায় সূর্যের আলো সেই পিঠে পড়ে না। আলোর অভাবে ওই পিঠ আমরা দেখতে পাই না। যদিও চাঁদের উলটো পিঠে তখন সূর্যের আলো পড়ে কিন্তু চাঁদের সেই আলোকিত পিঠ তখন আমাদের চোখের সামনে নেই।

ধ্রুবতারা ও সপ্তর্ষিমণ্ডল

সুশোভন বলল— স্যার বলেছেন কাল সন্ধেবেলায় ক্লাস হবে। কী মজা। রাতের বেলায় বন্ধুদের সঙ্গে স্কুলে থাকতে পারব। কেউ বকবে না।

পরের দিন ঠিক রাত আটটায় আমরা স্কুলের মাঠে হাজির। আকাশটা যে এরকম তারা দিয়ে সাজানো তা তো আগে দেখিনি। আমরা সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে। স্যার একটা জোরালো টর্চ জ্বালিয়ে তারা চেনাতে লাগলেন। ওই দেখো, ওই তারাটা—বলে স্যার টর্চটি জ্বেলে দিলেন। টর্চের আলো আকাশ পর্যন্ত পৌঁছোয় না তা তো আমাদের জানা ছিল। কিন্তু ওই আলোর পথ ধরে আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের কোন তারাটি বা তারাগুলো দেখাতে চান তিনি। স্যার বললেন— উত্তর-পূর্ব **দিকে দেখো। কেমন একটা প্রশ্নের চিহ্নর মতো সাজানো আছে** সপ্তর্ষি, **ঠিক যেন এটা প্রশ্ন চিহ্ন।**

হিমাদ্রি বলল— টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তারা দেখালেন স্যার। ওই হলো ক্রতু, তার পিছনে পুলহ। তারপর পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ আর মরীচি।

— সাতটা তারা মিলিয়ে নাম দেওয়া হলো সপ্তর্ষিমণ্ডল।

রাজীব বলল— বশিষ্ঠের একেবারে গায়ে গায়ে ওই ছোটো মতো ফুটকি তারাটির নাম কী?

স্যার বললেন— **ওর নাম** অরুন্ধতী। **বশিষ্ঠের স্ত্রী।**

সেই শুনে সবার কী হাসি।

অভিষেক জিজ্ঞেস করল— স্যার, ধ্রুবতারা কোনটা?

স্যার টর্চ জ্বাললেন। পুলহ আর ক্রতুর দিকে আলো ফেললেন। বললেন পুলহ আর ক্রতুকে — মানে ওপরের দুটো তারাকে একটা সরলরেখায় রেখে সোজা চলে যাও উত্তর দিকে। ওই দেখো একটা তারা মিটমিট করছে। তার নাম ধ্রুবতারা। সপ্তর্ষি তো বটেই আকাশের সব তারাই তার জায়গা পালটায়। কেবল ওটাকেই আমরা নড়তে দেখি না।

রুমা বলল— তাই বুঝি ওর নাম ধ্রুব।

মহাকাশ অভিযান ও ভারত

তিতিরের কাকু আবহাওয়া অফিসে কাজ করেন। তিতির শুধু এটুকু জানে যে কাকু কম্পিউটারে ছবি দেখে, আর বুঝতে পারে আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়া কেমন যাবে। এইতো কদিন আগে একটা বড়ো ঝড় হয়ে গেল বাংলাদেশে। কাকু প্রায় পনেরো দিন আগেই জানতে পেরেছিলেন যে ঝড়টা আসছে।

কাকু বলেন— আগে থেকে আবহাওয়ার খোঁজখবর জানার কাজটা কিন্তু একদিনে এত সহজ হয়নি। বিভিন্ন দেশের অনেক মানুষ বহুদিন চেষ্টা করেছেন তার জন্য।

তিতির বলল— আচ্ছা কাকু, তুমি অফিসের কম্পিউটারে ছবি দেখে কী করে আবহাওয়া বলো?

কাকু বললেন— আমাদের অফিসের কম্পিউটারের পর্দায় পৃথিবীর বাইরে থেকে তোলা পৃথিবীর ছবি দেখা যায়।

— কিন্তু পৃথিবীর বাইরে তো কেউ নেই। তাহলে কে তুলল ওই ছবি?

— বিজ্ঞানীরা ক্যামেরা বসানো একটা যন্ত্র পাঠিয়েছেন মহাকাশে। তারপর ঘুরিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের মতো করে। একেই কৃত্রিম উপগ্রহ বলে। তাতেই বসানো আছে আরও কত যন্ত্রপাতি।

তিতির তো অবাক; সে জিজ্ঞেস করল— কিন্তু পৃথিবীর বাইরে নিয়ে গেল কী করে এত সব কিছু?

— তুমি তো জানো, কোনো জিনিস ওপর দিকে ছুঁড়লে আবার মাটিতে ফিরে আসে। তাই রকেট ব্যবহার করা হয়েছিল ওইসব যন্ত্রপাতি মহাকাশে পাঠাতে।

তিতির বলল— আমি জানি, মানুষ চাঁদেও গেছে। কিন্তু মানুষ চাঁদে যাবার কথা ভাবল কেন?

তখন কাকু একটা গল্প বললেন— প্রাচীনকাল থেকে মানুষ দেখে এসেছে আকাশের বুকে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আমাদের দেশের আর্যভট্টও জানতেন, পৃথিবী নিজের চারপাশে পাক খায়, তাই দিন ও রাত হয়। কিন্তু দূরবিন আবিষ্কার হয় মাত্র চারশো বছর আগে। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি নিজেই তৈরি করে ফেলেন একটা দূরবিন। তার সাহায্যেই পৃথিবী থেকে অনেক দূরের বৃহস্পতি গ্রহকে দেখতে পান। আর দেখতে পান বৃহস্পতি গ্রহের বারোটার মধ্যে চারটে উপগ্রহকে। এরপর থেকেই মানুষ মহাকাশ নিয়ে আরও গবেষণা শুরু করে। এই গ্যালিলিওই প্রথম দেখান যে চাঁদ পৃথিবীর মতোই অসমান, গভীর খাদে ভরা একটা পাথুরে কঠিন বস্তু।

পাশের ছবি দেখে তোমরা কি বুঝতে পারছ যে আমাদের পৃথিবী সৌরজগতের একটা অংশমাত্র।

আমাদের সৌরজগতে সূর্য থেকে দূরত্ব অনুসারে গ্রহগুলো কেমনভাবে আসে তা পাশের ছবিতে দেখো। ছবি দেখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচে লিখে ফেলো।

কেমন গ্রহ	গ্রহদের নাম
(ক) সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে থাকা গ্রহ	
(খ) সৌরজগতের সবচেয়ে বড়ো গ্রহ	
(গ) বলয় আছে এমন গ্রহ	

তিতির বলল— এরপরই তাহলে মানুষ চাঁদে যাওয়ার কথা ভাবে?

— মানুষ প্রথমেই নিজে মহাকাশে যাওয়ার কথা ভাবতে পারেনি। কারণ ফিরে আসতে পারা যাবে কিনা সেটা তো নিশ্চিত ছিল না। তাই পাঠানো হলো একটা কুকুরকে,তার নাম ছিল লাইকা। তারপর ধীরে ধীরে

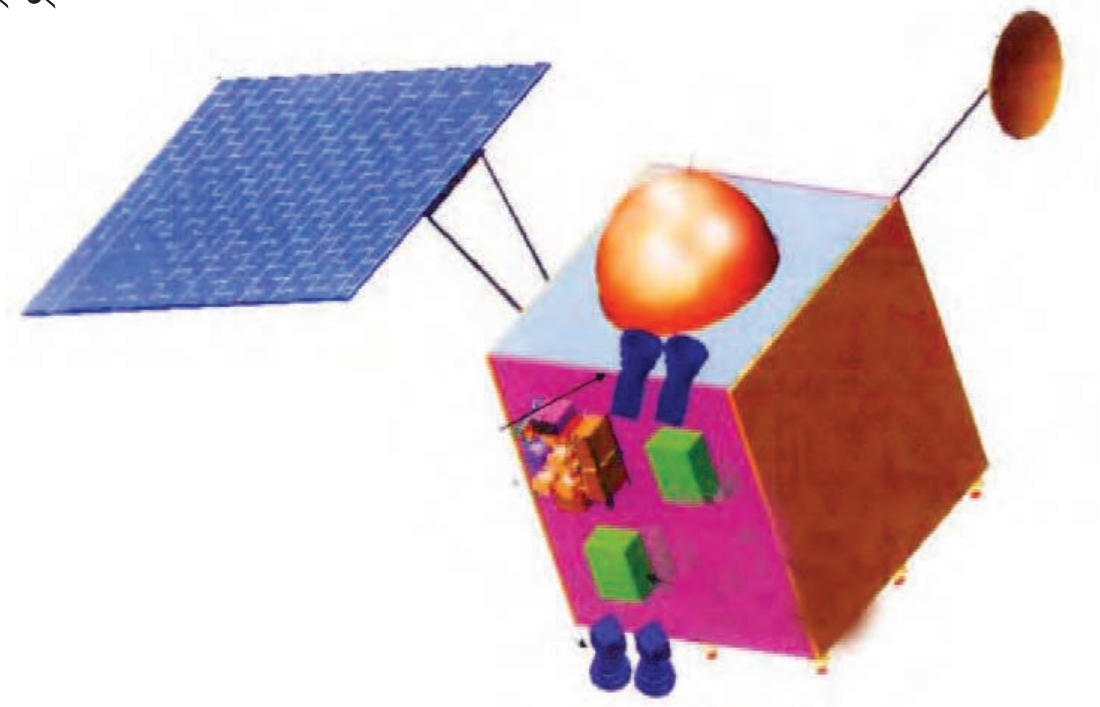

মানুষ যেতে শুরু করে। চাঁদের বুকে প্রথম পা দেন, নীল আর্মস্ট্রং। আমাদের দেশ থেকে প্রথম মহাকাশ অভিযানে যান রাকেশ শর্মা। এখন তো শুধু চাঁদ নয়,

মঙ্গল গ্রহের বুকে নেমেছে সন্ধানী যান— কিউরিওসিটি। শনিগ্রহের সন্ধানে গেছে ক্যাসিনি।

— আমাদের দেশ থেকে কিছু পাঠানো হয়নি মহাকাশে?

কাকু বললেন— শুরুতেই আমরা পারিনি। এখন আমরা নিজেদের দেশেই তৈরি 'চন্দ্রযান' পাঠাতে পেরেছি চাঁদে। মঙ্গলেও অভিযানের পরিকল্পনা চলছে।

— যে সমস্ত যন্ত্রপাতি পাঠানো হয় সেগুলোর কী কাজ?

— সেগুলোর কোনোটা মাটি পরীক্ষা করে, কোনোটা জল বা ধাতুর সন্ধান করে, আবার কোনোটা সেখানকার আবহাওয়ার খোঁজখবর নেয়।

— আর যে কৃত্রিম উপগ্রহগুলো পাঠানো হয়েছে, সেগুলো আবহাওয়ার খবর পাঠানো ছাড়া আর কী করে?

— আমরা মোবাইল ফোনে কথা বলি। আমাদের দেশের পাঠানো ইনস্যাট নামের অনেকগুলো কৃত্রিম উপগ্রহ এ কাজে সাহায্য করছে।

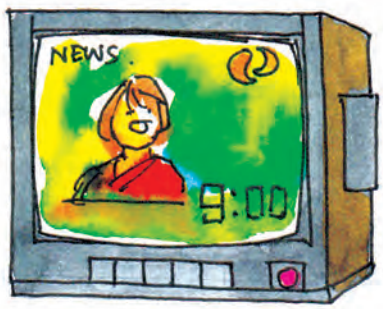

— ও, তাহলে মোবাইল ফোনে কথা বলার সময়েও ওগুলোর সাহায্য নিতে হচ্ছে।

— ঠিক তাই। তাছাড়াও বিদেশে খেলা হচ্ছে, আর তুমি টাটকা খেলা দেখছ। খবর দেখছ টিভিতে বা ধারাভাষ্য শুনছ রেডিয়োতে। সবই তো এই কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে।

ছবি দেখে বা নিজেদের কল্পনায় কাগজ বা পিচবোর্ড বা থার্মোকল কেটে নকল উপগ্রহের মডেল তৈরির চেষ্টা করো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

বাঁচার জন্য জল

আজকে পাড়ার রাস্তার জলের পাইপ সারানো হচ্ছে। সারাদিন জলের টানাটানি। ক্লাসে গিয়ে রীনা রিজিয়াকে বলল— 'হ্যাঁরে, তোদের কলে আজ জল এসেছে?

রিজিয়া বলল— না, বিকেলে আসবে।

দিদিমণি কী করে যেন শুনতে পেলেন! রিজিয়াকে বললেন— জল প্রকৃতির দান। জল না থাকলে সত্যিই খুব অসুবিধে হয়।

রাজীব বলল — আজ রাস্তায় একটা বোর্ড দেখলাম। তাতে লেখা - 'জল নষ্ট করবেন না। জলের আর এক নাম জীবন।'

দিদিমণি বললেন — তোমরা কোন কোন কাজে জল ব্যবহার করো?

রুকসানা বলল — খাওয়া, রান্না করা, স্নান করা, কাপড় কাচা এসব কাজে জল ব্যবহার করি।

দিদিমণি বললেন — পানীয় জল হলো সবচেয়ে দরকারি। বাসস্থানের কাছাকাছি জল থাকলে সুবিধে। তাই অনেক আগে থেকেই মানুষ ঝরনা, নদী বা জলাশয়ের কাছাকাছি থাকতে শুরু করেছিল। জলের কাছাকাছি থাকলে কী সুবিধে বলতে পারো?

— জলপথে আসা-যাওয়া করতে পারব। মাছ ধরতে পারব। ক্ষেতে জল দিতে সুবিধে হবে।

— হ্যাঁ। ঠিক তাই। এজন্য মানুষ এক সময় হ্রদে বা জলাশয়ে মাচা তৈরি করে থাকত। মানুষ দেখেছিল — ক্ষেতে যথেষ্ট জলের ব্যবস্থা না করলে গাছ মরে যায়।

মানিক বলল — বাড়ির কাছে নদী থাকলে বেশ নৌকো চালানো যায়।

দিদিমণি বললেন — নদীর ধারে বড়ো বড়ো জনবসতি গড়ে ওঠার একটা প্রধান কারণ এটাই। নদীতে ভেলা বা নৌকোর সাহায্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শস্য, কাঠ, পাথর এবং আরো জিনিস বয়ে নিয়ে যেত। এইভাবে

জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ব্যাবসাবাণিজ্যের আস্তে আস্তে উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু নদীর ধারে থাকার বিপদ কী বলোতো?

— বারেবারে বন্যা হবার ভয়।

অরুণ বলল — তাহলে তো দিদি তখনকার মানুষকেও বন্যা থেকে বাঁচার কথা ভাবতে হয়েছিল।

দিদিমণি বললেন — মানুষ প্রথমে নদীর উপর মাটির বাঁধ দিয়েছিল। পরে তাকে আরো নানাভাবে শক্তপোক্ত করেছিল। তারপর একসময় নদীতে সিমেন্টের পাকা বাঁধ দিল। তবে মানুষ এও দেখেছিল বন্যার জল সরে গেলে কৃষিজমিতে পলিমাটি থিতিয়ে পড়ে। এতে ফসল ভালো হয়।

বাড়ি ফেরার পর ক্লাসে জল নিয়ে ওদের আলোচনা শুনে আরতির দাদু বললেন — জল না হলে পৃথিবীতে প্রাণই সৃষ্টি হতো না। এখন পর্যন্ত জানা গেছে একমাত্র পৃথিবী গ্রহেই প্রাণ আছে। তার একটা বড়ো কারণ পৃথিবীতে জল আছে। জলেই প্রথম গাছ ও প্রাণীর জন্ম হয়েছিল।

এবার তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে জল নিয়ে নীচে লিখে ফেলো।

তোমার বাড়ি কোন জায়গায় (গ্রামে/শহরে)	
তোমার বাড়ির ব্যবহারের জল কোথা থেকে পাও	
কোন সময়ে জলের সমস্যা হয়	
তখন তোমরা কী করো	
বর্ষার জলকে কী করে ব্যবহার করা যায়	

আগুনের ব্যবহার

দিদিমণি ক্লাসে আসতেই সালাম বলল — একটা কথা বলব দিদি?

দিদিমণি বললেন — কী ব্যাপার সালাম? কী বলবে?

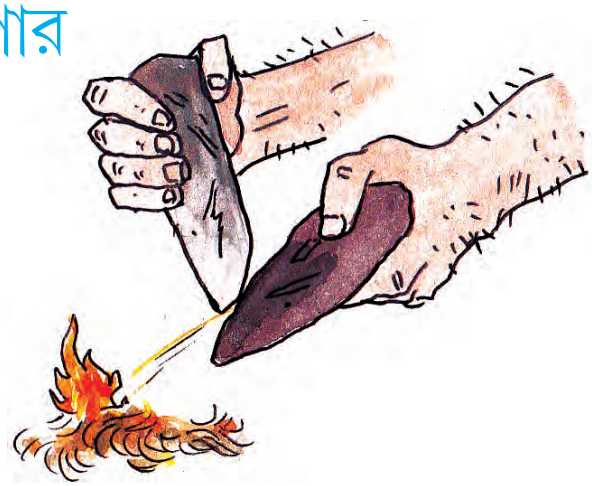

সালাম বলল — জানেন দিদি, কাল আমি আগুন আবিষ্কার করে ফেলেছি।

সবাই শুনল।

পলাশ বলল — আরে আগুন তো নানা কিছু থেকেই পাওয়া যায়। তুই কী করে আবিষ্কার করলি? দেশলাই দিয়েই তো আগুন জ্বালানো যায়।

সালাম বলল — আরে না। কাল আমি কয়েকটা পাথর নিয়ে খেলছিলাম। হঠাৎ দুটো পাথরে ঠোকাঠুকি করতে আগুনের ফুলকি বেরোলো।

দিদিমণি বললেন — ওগুলো তাহলে চকমকি পাথর হয়তো। ওভাবেই একসময় মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছিল। পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি লেগে হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল আগুন।

রাবেয়া বলল — তাহলে সালামের আগেই আগুন আবিষ্কার হয়ে গেছে।

দিদিমণি বললেন — সে হোক। তবু সালামও আগুন আবিষ্কার করেছে। এই যে ও নিজে হাতে জিনিসটা করল এটাই আসল।

অরুণ বলল — আচ্ছা দিদি, একসময় তো আগুনের ব্যবহার মানুষ জানত না?

দিদিমণি বললেন — ঠিক তাই। তখন তারা আগুনের সুবিধাও পেত না। ঠান্ডায় কষ্ট পেত। অন্ধকারে থাকত। কাঁচা খাবার খেত।

সালাম বলল — তারপর যখন আগুন আবিষ্কার করে ফেলল তখন?

দিদিমণি বললেন — তখন তো অনেক কিছুই বদলে গেল। আগুন জ্বেলে ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচল। আজও দেখবে খুব শীতে লোকে আগুন পোহায়। মানুষও অনেকদিন আগে তেমন আগুন পোহাত।

রানি বলল — তখন কি রান্না করে খেতে শিখল মানুষ?

--- এখন যেমন রান্না করা হয় তেমনটা পারত না। কিন্তু আগুনে খাবার ঝলসে নিত।

বিশু বলল — আমরা যেমন বেগুন-আলু এসব পোড়া খাই?

— একদম তাই। ঝলসে নিলে খাবার নরম হয়ে যেত। আগুনে ঝলসালে খাবারের জীবাণুও মরে যেত। আর সেগুলো হজম করাও সহজ হতো। এরফলে মানুষের শরীরে নানারকম বদল ঘটতে শুরু হলো। আর কাঁচার থেকে ঝলসানো, পোড়া খাবার খেতেও ভালো।

রানি বলল — দিদি, আগুন তাহলে শীত থেকে বাঁচাল। আগুনে খাবার ঝলসে খেতে শুরু করল মানুষ। আর কী কাজে লাগল আগুন?

দিদিমণি বললেন — আগুনকে সব পশু-পাখি ভয় পায়। মানুষ বন্য পশুর হাত থেকে বাঁচতে আগুনের ভয় দেখাত। আগুন থেকে আলো হয়। তা দিয়ে অন্ধকারেও চলাফেরা করা যায়। আর আগুন নানা কিছু পোড়ায়। পোড়াবার ফলে অনেক কিছু শক্ত হয়। অনেক কিছু আবার গলে যায়।

অরুণ বলল — দিদি, মাটি পোড়ালে শক্ত হয়। তাই কুমোরপাড়ায় মাটির হাঁড়ি, কলশি বানিয়ে পুড়িয়ে নেয়।

সালাম বলল — লোহা আগুনের তাপে গলে যায়। কামারশালায় লোহা আগুনে নরম করে পিটতে দেখেছি।

দিদিমণি বললেন — বাঃ ! বেশ খেয়াল করে দেখেছ তো! আগুনে পোড়ালে মাটির পাত্র সহজে ভাঙে না, নষ্ট হয় না। তাছাড়া পোড়া ইট ব্যবহার করত মানুষ বাড়ি বানাবার জন্য। আর পোড়ামাটির খেলনা, গয়নার কথা তো তোমরা জানোই। কাচ তৈরি করতেও আগুন লাগে।

বিশু বলল — আমার মামার বাড়ি বিষ্ণুপুরে। সেখানে মন্দিরও পোড়ামাটির তৈরি।

দিদিমণি বললেন — আগুন ব্যবহার করতে শেখার পর মানুষের জীবনযাত্রা বদলে গেছিল। আগুনকে তাই

পুরোনো দিনের মানুষ ভক্তি করত। আবার আগুনের ধ্বংস করার ক্ষমতার বিষয়েও তারা সচেতন ছিল। তাই তারা ভয়ও পেত আগুনকে। মানুষের রোজকার বেঁচে থাকার সঙ্গে জড়িয়ে গেছিল আগুন।

এবার তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আগুনের ব্যবহার শিখে মানুষের কী কী উপকার হয়েছিল তা নিয়ে নীচে লিখে ফেলো।

নানা কাজে আগুনের ব্যবহার	আগুনের ব্যবহারের আগে	আগুনের ব্যবহারের পরে
খাবার		
বাসস্থান		
নিরাপত্তা		
প্রতিদিনের কাজে		

গাছ আমাদের প্রাণ

সামনেই অরণ্যসপ্তাহ। স্কুলের মাঠে সবাই একেকটা গাছ পুঁতবে। কে কী গাছ পুঁতবে তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল ক্লাসে। করবী বলল আমি একটা নয়নতারা গাছের চারা আনব। রেহান বলল আমি আনব সবেদার চারা। কুহেলী অশ্বত্থের চারা আনবে। সমীরের বাড়ি নদীর বাঁধের খুব কাছে। গতবারের বন্যায় মাটি অনেক ধুয়ে গেছে। তাই সেখানে গেঁওয়া আর সুন্দরীর চারা পোঁতা হয়। আর তমাল আনবে বলল মেহগনি চারা।

দিদিমণিকেও আলোচনার কথা জানাল ওরা।

দিদিমণি বললেন— ঘরবাড়ি বানানো মানুষ যখন শেখেনি, গাছই ছিল তার থাকার জায়গা। কখনো- কখনো গাছের ওপর মাচা বেঁধেও থাকত।